প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৬

প্রকাশক : সুরজিৎ ঘোষ
প্রমা প্রকাশনী
৮ ওয়েস্ট রেঞ্জ
কলকাতা-১৭

মুদ্রক : রবীন্দ্রনাথ সিংহ
পাবলিসিটি প্রিণ্টাস
৪৫ রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সোমনাথ ঘোষ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের
অনুরাগীদের হাতে

লেখকের অন্যান্য বই :

মুখশ্রী উন্মোচনে
জলের আলপনা
অরণ্যশীর্ষে গোধূলি

ক
বি
তা
গ্র
ন্থ

সূচি

১

২

পরিশিষ্ট

The strong win against the weak
The strong lose against the stronger.
And across the bitter years and the
howling winters
The deathless dream will be stronger.

—Carl Sandburg

I suspect that without some undertone
of the comic
Genuine serious verse cannot be
written today.
Is it progress when T.V.'s children
know all names
of politicians, but no longer play
children's games.

—W. H. Auden.

Literature is a phase of life. If
one is afraid of it, the
situation is irremediable ; if
One approaches it familiarly
What one says of it is worthless. Words
are constructive
When they are true ; the opaque allusion
—the simulated flight
upward—accomplishes nothing.

—Marianne Moore.

ভগ্নসেতু

বিস্তীর্ণ এক জলরাশির দুই তীরে পড়ে রয়েছে একটি প্রাচীন সেতু। ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয়, এক সময় এই সেতুর ওপর দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত পরিচিত, ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক। কিন্তু সে দিন দূর অস্ত। আজ, কখনো কখনো ম্লান অপরাহ্নে, নির্জন সন্ধ্যায় কিংবা অলস ছুটির দিনের সূর্যালোকে জনসমাগম ঘটে ওই ভগ্নসেতুর দুই প্রান্তে।

একদিকে দেখা যায় কিছু মানুষ হেলাভরে চলে যাচ্ছে জলস্রোতের সমান্তরালে, ভগ্নসেতু তাদের কাছে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এমন কিছু মানুষকেও দেখা যায় যারা নিষ্ফল হতাশায় কখনো হাত তুলছে খোলা আকাশের দিকে, কখনো জলস্রোতের দিকে হাত নামাচ্ছে—কেউ কেউ হাত-পা ছুঁড়ে, সেতু নির্মাণের জন্য বিপরীত দিকের মানুষদের প্রতি জানাচ্ছে অনুনয় ও মিনতি।

এই ভগ্নসেতুর অপর তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কিছু রাগী ও উদ্ধত তরুণ, মৃদুস্বভাবী কিশোরী ও যুবতী, পরিণতবয়স্ক কোন কোন মানুষ যারা মন্ত্রধ্বনির মত শব্দ উচ্চারণে রত। সেই শব্দ-সমষ্টির মাধ্যমে তারা পারাপারের যে যোগসূত্র রচনা করতে চাইছে, তা সেতু নয়, —বাঁধ-নির্মাণের ব্যাপক প্রস্তুতির ফর্মুলা-র মত তা সাঙ্কেতিক, ইঙ্গিতবহ এবং গভীরতা-সন্ধানী।

মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে অবিশ্রান্ত জলধারা, ভোরের আলোর প্রসন্নতায়, দুপুরের সূর্যকিরণের প্রখরতায়, পাখি-ডাকা বিকেলের পড়ে আসা রোদে। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যেই ঘটে চলেছে এক আশ্চর্য, অনাদিকালীন ভাবের বিনিময়, নিঃশব্দে, অসঙ্কোচে, অবারিত আত্মনিবেদনে। কোন্ সেই আদিম যুগে মানুষ সৃষ্টি করেছিল বিশ্বপ্রকৃতির বিস্ময়কে প্রকাশ করার জন্য ভাষায় ঐশ্বর্য। আজ সেই বিস্ময়, সেই রহস্য, সেই বিদেহী অনুভূতি উন্মোচনে ভাষা হয়ে উঠল মানুষের কাছে পাথরের দেওয়ালের মত দুর্ভেদ্য। কবিত্বের অভিজ্ঞান বুকের মধ্যে চেপে ধরে বিংশ শতাব্দীতে একজন বলে উঠলেন,

"Oh my dear

I love you to the limits of speech and beyond

It's strange that words are so inadequate,

Yet, like the asthmatic struggling for words
So the lover must struggle for words." ১

শব্দমাধ্যম মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে সব সময়েই যে উৎকৃষ্ট তা নয়, এবং কবির সঙ্গে প্রেমিকের মৌল পার্থক্য, এই সংকটজনক অবস্থায়, নিতান্ত অল্পই। প্রশ্ন হ'ল এই যে, কবি এমন কি অলৌকিক ভাবনা প্রকাশ করতে চান, যাতে পরিচিত শব্দমাধ্যম হ'য়ে ওঠে পাহাড়-প্রতিম বাধা?

এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে কবি, কবিতা এবং পাঠক বা শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ-সূত্রের রহস্য জড়িত হ'য়ে আছে। আর, এ রহস্য উন্মোচনে দেশে ও বিদেশে কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় অন্তহীন বিতর্ক চলেছে বর্তমান কাল পর্যন্ত। যিনিই যেভাবে কবিস্বভাবের রহস্য উন্মোচনে ব্রতী হ'য়ে থাকুন না কেন,—এ প্রসঙ্গে প্লেটোর চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে। কবিত্ব ও কবিদের সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর মতামতের মধ্য থেকেই যে কবিত্বের স্বরূপ ধরা পড়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কবিকর্ম সম্পর্কে প্লেটোর যে ধারণা ছিল, তা নিতান্ত বিরোধী-মনোভাব-সম্পন্ন। কিন্তু কবিত্বের যথার্থ ছাড়পত্র সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা ছিল—কারণ প্রথম জীবনে তিনি কবি ছিলেন। পরবর্তীকালে প্লেটো তাঁর দর্শনের দুরূহ ও জটিল আলোচনার মধ্যেও সেই কবিস্বভাবকে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। কিন্তু প্রথম যৌবনে সক্রেটিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর প্লেটো তাঁর সব কবিতা পুড়িয়ে ফেলেন,—এবং যুক্তি ও আদর্শবাদ তাঁর সমগ্র জীবনের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে।

প্লেটো যে আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেন. সেখানে কবিদের স্থান ছিল নিষিদ্ধ। তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ "The Republic" এর দশম অধ্যায়ে, শিল্প তথা কবিকর্ম সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে, প্লেটো কবিচরিত্র ও তার সৃষ্টি সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থ ছাড়াও প্লেটো তাঁর অন্যান্য রচনায় কবিকর্ম সম্পর্কে নানাবিধ মন্তব্য করেছেন, এবং তাঁর মন্তব্যের সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে কবিতাশিল্পের প্রতি প্লেটো প্রসন্ন ছিলেন না, কারণ কবিরা এক অলৌকিক উন্মাদনার উপর নির্ভরশীল। মানবিক যুক্তি ও নীতিবোধ তাদের রচনায় দৃশ্যমান নয়। সুতরাং মানবচরিত্রের উপর কবিদের প্রভাব যে শুভ হয়ে ওঠেনা,—এ সম্বন্ধে প্লেটো বরাবরই নিশ্চিত ছিলেন। তাছাড়া বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্লেটোর দর্শন, এই কবিতা প্রসঙ্গকে করে তুলেছে আরো আকর্ষণজনক।

আমরা অনেকেই জ্ঞাত আছি যে প্লেটো ছিলেন এক অসাধারণ আদর্শবাদী, তাঁর এই আদর্শবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সত্যের অন্বেষণ করেছেন, যা শুধু নিখুঁত, পরিপূর্ণ এবং সুগোল নয়—বিশ্বপ্রকৃতিতে তার কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। অর্থাৎ প্রকৃতিতে আমরা যা কিছু দেখি বা ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করি, তা সেই সর্বজনীন ধারণায় বিশেষ বিশেষ অসম্পূর্ণ উদাহরণ মাত্র। মানুষ বস্তুর এই particular উদাহরণই প্রকৃতিতে লক্ষ্য করতে পারে—অর্থাৎ সেই চরম আদর্শগত সর্বজনীন ধ্যানের মাধ্যমে যে সত্য লাভ করা যায়, বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা তা কখনোই সম্ভব নয়। এবং বস্তুময় এই বিশ্ব সেই চিরকালীন ধ্যানের অনুকরণ মাত্র তথা প্রতিবিম্ব-প্রতিম।

কবিরা যখন এই বস্তু-বিশ্বের অনুকরণে কবিতা সৃষ্টি করেন, তখন তাঁরা সত্যের অন্বেষণ করেন না,—তাঁরা অনুকরণের অনুকরণ করেন মাত্র। প্লেটোর মতে,

> "We may take it, then, that all the poetic company from Homer onwards are imitators of images of virtue and whatever they put in their poems, but do not lay hold of truth."[২]

সুতরাং এই অনুকরণকারীরা বা প্রতিবিম্ব সৃষ্টিকারীরা সার সত্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না; ছায়ার মত অসার বস্তু সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান সীমিত। এই অনুকরণ একধরণের খেলা মাত্র বলে তাঁরা কখনোই আন্তরিক নন। যেহেতু প্লেটো ছিলেন যুক্তিবাদী, সে কারণে আত্মার যে অংশ যুক্তির ভারসাম্যে অটল,—যা সহজে বিচলিত হয়না, আবেগে বিক্ষিপ্ত হয় না, শোকে উন্মাদ হয় না, তার দিকেই তাঁর পক্ষপাত প্রবল। কিন্তু কবিদের প্রভাব তার বিপরীত,- মানুষের আত্মার দুর্বল অংশে অভিঘাত সৃষ্টি করে তার আচার-আচরণকে তাঁরা বিভ্রান্ত করে তোলেন; এবং বহু মানুষকে উত্তেজিত করার জন্য কবিরা আবার সেই অংশ অনুকরণ করেন, কাব্যে—যা সাধারণ মানুষ সহজে অনুকরণ করতে পারে।

অর্থাৎ প্লেটোর মতে, যথার্থ বাস্তব অবস্থার হীনতর অংশকে, অনুকরণ দ্বারা প্রকাশিত করাই হ'ল কবিদের কাজ। আত্মার শ্রেষ্ঠ অংশ উন্মোচনে তাঁদের ভ্রূক্ষেপ থাকেনা,—সত্য থেকে তাঁরা থাকেন অনেক অনেক দূরে—

> "Thus we are justified at once in refusing to let him into a city which is to be ordered well; because he

arouses and fastens and strengthens this part of the soul, and destroys the rational part...... The imitative poet..... establishes an evil constitution in his soul; he gratifies the unthinking part of it which does not know the difference between greater and less, but which believes the same things to be now great and now small, by imaging images very far and far indeed from truth."[৩]

প্লেটোর কবি ও কাব্যতত্ত্বের আলোচনা থেকে আরো একটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে কবিরা মহৎ ভাব কিংবা অত্যন্ত সাধারণ এবং ক্ষতিকারক আবেগ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে একই রকম ভাবে মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে পারেন,—এবং তাঁদের উভয়বিধ রচনা যে শ্রুতিসুখকর হয়ে ওঠে, এ কথা তিনিও স্বীকার করে গেছেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার কবিকর্মে মানব প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য তথা বৈপরীত্য বর্ণনা করার আগ্রহ ছিল কবিদের এবং সত্য ও মিথ্যা, সার ও অসার, আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে নির্মোহ মনোভাবে তুল্যমূল্য বর্ণনায় তাঁরা পারদর্শী ছিলেন। জীবধর্মের যে প্রকাশমান ও স্ফুটোনোন্মুখ প্রবৃত্তিগুলি মানুষকে তাড়িত করে, বিক্ষিপ্ত করে, উদ্দীপ্ত করে, সে সম্পর্কে কবিরা ছিলেন সংশয়হীন। কবিকর্মের এই বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্লেটোর শিষ্য অ্যারিষ্টট্‌ল-এর কাব্যতত্ত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। আরিষ্টট্‌ল ও প্লেটোর দর্শন-তত্ত্বের মধ্যে মিল ও পার্থক্য কোথায়, সে আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর বলে মনে হ'লেও একথা বলা প্রয়োজন, কবিতা সম্পর্কে উভয়ের মতপার্থক্য গড়ে উঠেছে, সর্বজনীন ধারণা বা Universal সম্পর্কে উভয়ের মনোভাবকে ভিত্তি করেই এবং প্লেটোর কাব্যতত্ত্বের প্রতিবাদে, আরিষ্টট্‌লের উত্তর বা আলোচনার উৎস,—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই সঞ্জাত। প্লেটো ছিলেন চরিত্রে ও চিন্তায়, গণিতসুলভ সম্পূর্ণতা ও ত্রুটিশূন্যতার অভিমুখী, পরিচিত তথা পার্থিব জ্ঞানের সীমা অতিক্রমকারী এবং কঠোরভাবে বিমূর্তভাবের উপাসক। প্লেটোর আদর্শবাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, তুলনায় আরিষ্টট্‌ল ছিলেন জীববিজ্ঞানে অনুরাগী, প্রকৃতিবাদী এবং বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে উৎসাহী। অন্বেষণকারী প্লেটোর মতই আরিষ্টট্‌ল মনে করতেন যে কবিতা এমন একটি শিল্প যাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার পর, তার প্রশংসা বা নিন্দার ভিত্তিভূমি হবে সমগ্র মানবীয় সম্পর্ক, এবং

সেই সম্পর্কই স্থির করবে কাব্য-উপভোগের কার্যকারণ। কিন্তু এ কথা মেনে নিলেও আরিষ্টট্‌ল কবিতাকে তার নিজস্ব ও স্বাধীন চরিত্রের মহত্বে স্থাপিত করার চেষ্টা করেছেন ; এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি কাব্যতত্ত্বকে একটি স্বতন্ত্র দর্শনের পটভূমিকায় দেখতে বা দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণায় কবিতা একটি গভীর ও অন্তর্গূঢ় দর্শন—এবং তার কাজ সর্বজনীন ধারণাকে নিয়েই ; এই মন্তব্যের মাধ্যমে আরিষ্টট্‌ল প্লেটোর মতবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ জানিয়াছেন। তিনি বলেছেন কবিতার কাজ এই নয় যে কি ঘটেছে তার বর্ণনা করা ; তার লক্ষ হ'ল, কি ঘটতে পারে তার পরিচয়দান। তাঁর মতে কবিতা এমন এক শিল্প যার আদর্শ হ'ল অসম্ভব ঘটনা যা কাজকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলার সাধনা। এইখানেই সম্ভবতঃ কবিরা কালজয়ী। আর একটি ক্ষেত্রে আরিষ্টট্‌ল প্লেটোর কাব্যবিমুখতার ভিত্তিভূমি প্রায় সরিয়ে দিয়েছেন—এ কথা বলা চলে,—আর সেটি হ্ল "অনুকরণ"-প্রসঙ্গ। অনুকরণের মাধ্যমে কবিরা সত্য থেকে বহুদূরে চলে যান, একথা প্লেটো বলেছেন ; অর্থাৎ কবিরা যেন সত্য থেকে অসত্যের পথে, আলো থেকে অন্ধকারে, জ্ঞান থেকে অজ্ঞানের দিকে তাঁদের শিল্পকে এবং সেই সঙ্গে শ্রোতা বা পাঠককে টেনে নিয়ে যান।

আরিষ্টট্‌ল কিন্তু "অনুকরণ"-এর পরিপ্রেক্ষিতে বললেন যে, কবিকর্মের অভিজ্ঞান হ'ল এই যে, এখানে অনুকরণ হ'য়ে ওঠে Reality বা বাস্তবের চেয়েও উৎকর্ষ-প্রয়াসী। প্রকৃতি যেখানে ব্যর্থ হয়, শিল্প সেখানে পূর্ণতা দান করে, কিংবা বলা যায়, বিশ্বপ্রকৃতিতে যেখানে অসম্পূর্ণতা আছে, শিল্প চেষ্টা করে তার হারানো সূত্রের অনুকরণে, পরিপূর্ণতা লাভ করার লক্ষ্যে। কবিতাক্ষেত্রে অনুকরণের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে কবিকর্ম অনুকরণ করে মানবপ্রকৃতির কর্মচঞ্চল দিকটির প্রতি,—তার আবেগের চরিত্র, তার সাধনা ও অভিজ্ঞতার বিচ্ছুরণের প্রতি। মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত ও অলক্ষ্য কর্মতৎপরতার অনুকরণই হ'ল কবিকর্মের অনুকরণ।

প্লেটো ও আরিষ্টট্‌ল-এর কাব্যতত্ত্ব থেকে একটা কথা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে, কবি-প্রতিভার সৃষ্টি জনসমাগমের তথাকথিত আনন্দ-বিনোদনের পক্ষে উপাদেয় বস্তু নয়। কবি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যরূপে প্লেটোর 'Divine Madness' এর তত্ত্ব এবং অসম্ভব ঘটনাকে কল্পনার সাহায্যে শব্দমাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার সাধনা সম্পর্কে আরিষ্টট্‌ল-এর মতবাদ, আকারবিহীন জনসমাজের কাছে উপভোগ্য নয়। যা ইন্দ্রিয়কে প্রবলভাবে ধাক্কা দেয়, এমন মূর্ত এবং স্পর্শগ্রাহ্য বিষয়

সম্পর্কে মানুষ চিরদিন মেতেছে। মন বা আত্মার সূক্ষ্ম উপভোগের চেয়ে শরীরী সুখকে সে করেছে বরণীয়। কিন্তু, কবি দাবী করেছে পাঠকসাধারণের কাছে তার শ্রুতিসূক্ষ্মতা ও কল্পনার গভীরতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেই প্রাচীন যুগ থেকে কবি ও শ্রোতা বা পাঠকের মধ্যে যোগসূত্রের সেতু কোন কালেই অভেদ্য পাথরের মত কঠিন ছিল না, এবং সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত শ্রেণীর মানুষের স্বচ্ছন্দ যাতায়াতের পক্ষে তা ছিলনা যথেষ্ট পরিমাণে ঘাতসহ এবং ভাবগ্রহণে সমর্থ।

প্লেটো অথবা আরিষ্টটল বিধিমতে কবি ছিলেন না, কিন্তু কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় তাঁরা ছিলেন মেধা ও মনন-এর নৈর্ব্যক্তিক দার্শনিক। মানব আত্মার উত্তরণ এবং অধোগতি, কবিতার দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে, তারই তাত্ত্বিক আলোচনা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি; অর্থাৎ সমাজ-মানস, তথা বৃহত্তর মানব সভ্যতায় নৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ছিল এ বিষয়ে মৌল বিচারের ভিত্তি। তাছাড়া গ্রীকযুগে কবিতার প্রকাশ ছিল নাটকের সংলাপের ঘেরাটোপেই। কবিতা যে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট একটি শিল্পকর্ম, তার পরিচয় সে যুগে খুব সুলভ ছিল না। রোমান যুগেই তার সুস্পষ্ট প্রকাশ।

আরিষ্টট্লের দুটি শতাব্দী পরে এ প্রসঙ্গে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রোমান কবি হোরেস (খৃষ্টপূর্ব ৬৫-খৃঃ পূ ৮); একই সঙ্গে কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যতত্ত্ব আলোচনায় তিনি পরবর্তীকালের অনেক কবি ও কবিতাপ্রেমিকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে কবিতা-সম্পর্কে এক শ্রেণীর মানুষের বীতরাগ তথা বিতৃষ্ণার কথা বলা প্রয়োজন। আধুনিক যুগে বিংশ শতাব্দীতেই যে মানুষ কবিতা সম্পর্কে বীত-স্পৃহ হ'য়েছেন,—এ কথা সত্য নয়। সমাজ ব্যবস্থার বিক্ষেপ ও আলোড়নের সময় কবিতা প্রায়শই বিলাসের সামগ্রী হ'য়ে ওঠে। রোমান রিপাব্লিক-এর অস্থির যুগে রাজনৈতিক এবং শাসনতন্ত্রের গতিপ্রকৃতি কবিতার রুচিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে। রোমান যুগের প্রখ্যাত বাগ্মী এ গদ্য লেখক সিসেরো (খৃষ্টপূর্ব ১০৬—খৃষ্টপূর্ব ৪৩) বলেছিলেন, "আমার জীবনের আয়ু যদি দ্বিগুণ হত, তবুও 'লিরিক' কবিতা পড়ার সময় আমার হ'ত না।" স্মরণীয় সমরপ্রতিভা ও শাসক সীজার বলেছেন, "একটি পাহাড়কে যেমন তুমি পাশ কাটিয়ে যাও, তেমনি অস্বাভাবিক বা বিচিত্র শব্দকে এড়িয়ে যাবে।" অস্বাভাবিক বা বিচিত্র শব্দসমাহার যে কবিতার প্রাণশক্তি, একথা অবশ্য বলা বাহুল্য।

হোরেস যে সময়ে কবিতা লিখেছিলেন সে সময় শিল্প সাহিত্যে রোমান সাম্রাজ্যের অফুরান ও উদার পৃষ্ঠপোষণার কাল। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সেই শান্তি ও শৃঙ্খলার যুগে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য, রোমহর্ষণকারী উত্তপ্ত বক্তৃতার প্রয়োজন ততটা ছিল না—ফলে মধুর ও মনোহর শব্দসমাহারের সাহায্যে মনোরম কবিতায়, রোমান ঐতিহ্যের গুণপনা বর্ণনায় অবকাশ ছিল নিশ্চিন্ত। হোরেস তাঁর কবিতা এবং কবিতার মাধ্যমে কবিতায় নীতি—আদর্শ—তত্ত্ব, নিবেদন করেছেন যাঁদের উদ্দেশে, তাঁর কেউ রাজনীতিবিদ ছিলেন না, কিংবা ছিলেন না তার্কিক "সফিষ্ট" অথবা দার্শনিকবৃন্দ। তাঁর কবিতার লক্ষ্য ছিল সহকর্মী কবি, কবিতাপ্রেমিক, সমালোচক, সৌখীন রোমান, উচ্চাভিলাষী তরুণ পদ্য লেখকবৃন্দ। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তাঁর কাব্যকথা কয়েক শতাব্দীকাল কবিতাপ্রেমিকদের প্রিয় সঙ্গীরূপে গণ্য ছিল।

আরিষ্টট্‌লের কাব্যতত্ত্বের প্রভাবে গ্রীকযুগে, এবং রোমান আমলেও কবিতার যে তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ ছিল, তা'হল এপিক্ বা মহাকাব্য, ট্রাজেডি ও কমেডি। হোরেস এর সময় কবিতার এই শ্রেণীবিভাগের বহুলাংশে রূপান্তর তথা পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন শুধু আকৃতিগত নয়, তা সংখ্যাগতও বটে। হোরেস-এর সময়ে উপরোক্ত তিনটি শ্রেণী ছাড়াও, আরো যেগুলি প্রচলিত ছিল, তারা হ'ল গীতিকবিতা, রাখালবালক তথা চারণভূমির চিত্রময় বর্ণনার কাব্য, ব্যঙ্গকবিতা, শোকগাথা, তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাময় কবিতা (Epigram) ইত্যাদি। প্রতিটি কাব্যরূপের বিশ্লেষণ ও আলোচনা ছিল গ্রেকো-রোমান কাব্যতত্ত্বের নিশানা বা লক্ষ্য। সুধী পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটলে এ প্রসঙ্গে হোরেস্-এর একটি বিখ্যাত রচনা তথা কবিতার আলোচনা করা যেতে পারে।

জীবনের প্রথম পর্বে গীতিকবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা প্রভৃতি লিখলেও; হোরেস্ তাঁর সেরা কবিতাগুলি লেখেন মধ্যবয়সে, এক হিসেবে তাঁকে মধ্যবয়সের কবি বলা চলে এবং তাঁর কবিতার আদর্শ ছিল বৌদ্ধধর্মসুলভ মধ্যপথ অবলম্বন। Ars Poetica নামে যে রচনা তাঁকে পরবর্তীকালে স্মরণীয় করেছে, তা হ'ল বিচিত্র বিষয়ে পত্রাবলীর সমাহার। সমসাময়িক কবি ও কবিতা অনুরাগীদের উদ্দেশে লিখিত এইসব চিঠিপত্রে রোমানযুগের কাব্যতত্ত্বের কিছু নিশানা পাওয়া যায়।

আধুনিক যুগের এক সৌখীন সমালোচক জর্জ সেণ্টস্‌বারী, Ars Poetica সম্পর্কে—অত্যন্ত সাধারণ তথা মাঝারি শ্রেণীর কবিতারূপে, মন্তব্য করেছেন। এই মন্তব্য থেকে যে প্রশ্ন এসে পড়ে, তাহ'ল কবিতাসৃষ্টিতে নিখুঁত দক্ষতা অর্থাৎ

বক্তব্য বিষয়ে অমোঘ ও যথার্থ কুশলতা কবিপ্রতিভার অন্তরায় কিনা—অথবা, এই নিখুঁত কুশলতা কবির অগ্রগতির পথে পাথেয় কিনা। হোরেসের কবিতা, আমাদের আরো একটি চিরন্তন প্রশ্নের সম্মুখীন করে: ছিম্‌ছাম্‌-সুন্দর-বাহারী কবিতার প্রয়োজন আছে কিনা? কোন কোন সমালোচক অথবা কবিদের নিখুঁত কবিতার প্রতি হয়ত' পক্ষপাত আছে, এবং তাঁরা প্রায় উন্নাসিক দম্ভে এই মাঝারি শ্রেণীর কবিদের ছিম্‌ছাম্‌ রচনাকে খারিজ করে দিতে চান। হোরেস তাঁর কাব্যতত্ত্বে কিন্তু কবিত্বের সুগোল তথা পূর্ণাঙ্গরূপের ওপরই জোর দিয়েছেন, এবং তাঁর ধারণা অনুযায়ী ওই পূর্ণসংহতিই কবিত্বের অভিজ্ঞানস্বরূপ। বিংশ শতাব্দীতেও এই প্রশ্নের যে সংশয়াতীত সমাধান ঘটেছে, একথা বলা যায় না। হোরেসের এই কবিতাটি একাধারে কবিতার তাত্ত্বিক আলোচনা, কবিতার ব্যবহারিক উদাহরণ—এবং বিচিত্রবিষয়সঞ্চারী ঘনিষ্ঠ ও মনোজ্ঞ পত্রাবলীরূপে গণ্য। প্রায় দু'হাজার বছর আগে কবিতার আসল রহস্য যে কি এ বিষয়ে কবিমানসের যে দ্বিধা বা সংশয় ছিল—হোরেসের রচনা তার প্রমাণ: তিনি বলেছেন

> "লোকে প্রশ্ন করে একটি ভালো কবিতা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়, না তার জন্য কুশলী দক্ষতার প্রয়োজন.—আমার ধারণা এই যে যথেষ্ট প্রেরণা ছাড়া গ্রন্থপাঠ কিংবা প্রতিভার অপরিণতি, বেশী দূরে যেতে পারে না। দুটি বস্তুর অঙ্গাঙ্গী মিলনই কাম্য।"

সুতরাং তাঁর পূর্ববর্তী কাব্যতত্ত্বে শব্দযোজনার কুশলতা ও ছন্দের যে প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তার কোন মোহ ছিল না, আবার শুধু প্রেরণা এবং ইন্দ্রিয়জ সংবেদনশীলতাই কবিত্বের ছাড়পত্র, এই বিপরীত ধারণা সম্পর্কে তিনি নির্মোহ ছিলেন। হোরেস সম্পর্কে এই আলোচনা, এই প্রবন্ধে উত্থাপিত করার মৌল কারণ হ'ল কবি ও কবিত্ব সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছন্দ অথচ সারগর্ভ কয়েকটি মন্তব্য আছে, যা সর্বশ্রেণীর, বিশেষ করে' এই উৎকেন্দ্রিক বিংশ শতকের শেষ পাদের কবিদের কণ্ঠস্থ করে রাখা উচিত। **Ars Poetica**-র তাত্ত্বিক অংশে কাব্যতত্ত্বের বদলে কবি হ'য়ে ওঠার আশ্চর্য সপ্রতিভ কয়েকটি মন্তব্য আছে। উচ্চাভিলাষী এবং অতি উন্নাসিক কবিদের জ্ঞাতার্থে তার কিছু অংশ নিবেদন করি।

"ভবঘুরে হয়োনা; স্নান তোমার প্রেরণাকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবে না। সক্রেটিসের রচনা পড়ে জ্ঞান অর্জন কর। রোমান বণিকসুলভ শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ তোমার কবিতার সম্ভাবনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।...... তোমার প্রেরণার ওপর জোর খাটিও না, কবিতা লিখে তাড়াতাড়ি ছাপাবার জন্য ছুটো

না। কবিতার ইতিহাস, তার পবিত্র কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হও। লক্ষ্যকে উঁচুতে রাখো। বন্ধুদের প্রশংসার কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ কোর না। সৎ সমালোচকের মতামত নাও এবং তার অনুসরণ কর। স্থির হও, সেরা কবি উন্মাদ ন'ন। .... ”

হোরেসের এই উপদেশ নিশ্চয়ই কবিতা-রহস্যের চাবিকাঠি আবিষ্কারে কবিদের সাহায্য করবে না, কিন্তু তাঁর সহৃদয় অনুরোধের মধ্যে যে নির্মোহ ও নিষ্কলঙ্ক চিন্তাধারার প্রকাশ আছে, তার মাধ্যমে কবিরা তাঁদের স্বরূপ দর্শনে জীবনের কোন না কোন মুহূর্তে থমকে দাঁড়াবেন। এই তাৎক্ষণিক চমক তাঁদের আত্ম-আবিষ্কারের অন্যতম অভিজ্ঞানরূপে অবশ্যই চিহ্নিত হবে, এবং তা হবে এই ফিল্ম-রেডিও-টেপ্-স্টিরিও-টেলিভিশনের যুগেও। কল্পনার পাখায় ভর করে' যাঁরা অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন কিংবা সমুদ্রের অতল গভীরতা প্রতিম সন্ধান যাঁদের লক্ষ্য হোরেস্ সেই বিরলতম শ্রেণীর কবিসমাজের অগ্রনায়ক ন'ন। বরং জীবনের মুগ্ধতা ও রসমাধুর্যে যাঁরা প্লুত ও আবিষ্ট, তিনি সেই কবিদের আদর্শ। যাঁরা নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার সীমিত গণ্ডী সম্বন্ধে সজাগ হোরেসের কবিতা তাঁদের পরম আশ্রয়। দুঃখের বিষয় এই সহজ ও স্পষ্ট আত্মদর্শন, এযুগের অনেক প্রতিষ্ঠিত ও অভিজ্ঞ কবির কল্পনারও নেপথ্যে রয়ে গেছে,—সম্ভবতঃ ভবিষ্যৎ মানব সমাজের উদাসীন ও তাৎক্ষণিক উপহাসের উপাদানরূপে।

* *

গ্রেকো-রোমান কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে যে পরিমাণ আলোচনা সচরাচর-লক্ষ্য করা যায় দেশী ও বিদেশী সমালোচনায়, প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট আলঙ্কারিক ও তাত্ত্বিক বিদগ্ধজন সম্পর্কে ঠিক একই পরিমাণ ঔদাসীন্য দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের ধারণায় কোন ত্রুটি বা ন্যূনতা ছিল, একথা অবশ্য আজো প্রমাণিত হয়নি ; সুতরাং আধুনিক যুগে স্বাধীন এবং পক্ষপাতহীন জিজ্ঞাসা, এ প্রসঙ্গে যে একান্ত জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের ধারণায় বলা হয়েছে যে কাব্য হল রসাত্মক বাক্য। প্রশ্ন এই যে, রস কাকে বলে ? নাট্যশাস্ত্রের রচয়িতা ভরত (আনুমানিক খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) বলেছেন যে রসই কাব্য তথা সাহিত্যের বীজ। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে রস সম্পর্কে আলোচনা-ব্যাখ্যা-টীকা ইত্যাদি অনেক ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত। সে প্রসঙ্গে বিশদভাবে যাওয়ার প্রয়োজন এ আলোচনায় তেমন প্রার্থিত নয়। তবে সামান্য কিছু বক্তব্য উৎসাহী পাঠকের সামনে উপস্থিত করা বোধ হয় বিধেয়।

রসসৃষ্টি কবিতার চরম পরিণতি। এই পরিণত অবস্থায় পৌঁছতে কবিতাকে পেরিয়ে আসতে হয় অন্তবিহীন পথ। 'মরুতীর হ'তে সুধা শ্যামলিম পারে'— কবিতার এই পথ-পরিক্রমায়, যিনি চালক, তিনিই কবি, একথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। এবং পথের প্রায় প্রতিটি বাঁক পেরোবার সময় কবিতার শরীরে যে বিবর্তন ঘটে তার জন্য কবির অন্যতম এবং আদিম পাথেয় হ'ল শব্দ। শব্দই কবিতার শরীর। আর, এ শরীরকে মনোরম করে তুলতে হলে সুন্দর শব্দ-যোজনার কৃতিত্ব, যে কবির যত সুচারু, কবিত্বের অভিজ্ঞানপত্র দাবী করার ক্ষেত্রে সেই কবির জোর স্বভাবতই তত বেশী। কাব্যতত্ত্বের আলোচনায় যাঁরা দেহাত্মবাদী তাঁরা কবিতায় শব্দের প্রাধান্য দিতে চান, এবং এ শব্দের সাজসজ্জা তথা অলংকারের কুশলতার মধ্যেই যে কবিত্ব-শক্তি নিহিত—একথাও বলে থাকেন। ভাষার মাধ্যমেই যখন কবিতার প্রতিমা নির্মিত হয়, তার উন্মুক্ত প্রকাশ যেহেতু শব্দের মাধ্যমেই শ্রোতা ও পাঠকের উপভোগের কারণ হয়,— সুতরাং সেই অবস্থায় শব্দ যেখানে নেই, কবিতাও সেখানে অনুপস্থিত। প্রাচীন, আলংকারিক দণ্ডী (খৃষ্টীয় ৭ম শতক) এ কারণেই বলেছেন, "শরীরং ভাবদিষ্টার্থ ব্যবচ্ছিনা পদাবলী"।

কিন্তু শুধু শব্দ-সমাবেশের কুশলতা নয়—শব্দের অলংকরণের দ্বারাই, কবি স্রষ্টা হয়ে ওঠেন, এবং কবিকৃত বিচিত্র-সুন্দর শব্দের সাজ-সজ্জার সঙ্গে, তাদের মাধ্যমে বিশেষ অর্থও ফুটে ওঠে, রাত্রিশেষের আলোর মত, ধূসর গোধূলির চিত্রিত প্রকৃতির মত। এই কারণেই কবিরা শব্দ-সজ্জার জন্য যে অলংকার ব্যবহার করেন তার চরিত্র দ্বিবিধ। একটি শব্দালংকার (অনুপ্রাস-শ্লেষ-যমক) এবং অন্যটি অর্থালংকার (উপমা রূপক-উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি)। কবিতাকে যদি শ্রুতিসুভগ হ'তে হয়, তার শব্দযোজনায় যদি ভাবমাধুর্য আরোপ করতে হয়, তাহলে এই দুটি অলংকারের প্রয়োগে কবিতা উপাদেয় হ'য়ে ওঠে। ভাষাকে তার আটপৌরে অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে, মনোহর ও আকর্ষণযোগ্য করে তুলতে হ'লে এই অলংকার প্রয়োগের কুশলতা যে কোন কবির শক্তির প্রাথমিক অঙ্গ। একারণেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের কীর্তিমান আলোচকেরা অনেকেই ছিলেন আলংকারিক এবং কবিতার রহস্য উন্মোচনে যে শাস্ত্র রচিত হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে অলংকারশাস্ত্র।

কিন্তু অলংকারপ্রয়োগে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যতই আকর্ষণকারী হোক, অনেক রচনা শুধু তাকে আশ্রয় করেই কবিতা হয়ে ওঠেনা। অর্থাৎ সুন্দর শব্দযোজনা,

বর্ণনায় বিধিসম্মত অলংকার প্রয়োগ কবিত্বের চূড়ান্ত ছাড়পত্র নয়; তার প্রমাণ পাওয়া যায় জয়দেবের কবিতায়। শব্দমাধুর্যে সেখানে কবিতার বহিরঙ্গের চাকচিক্য যতই থাকুক, তাতে মন ভরে না। এই মন না ভরে ওঠার উদাহরণ পাওয়া যায় ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাতেও। এই জন্য আলঙ্কারিকেরা বলেছেন "যা শ্রেষ্ঠ কাব্য তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাক্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থ মাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়; সেই কথাবস্তু কাব্যের প্রধান নয়"।[৪] অর্থাৎ কবিত্বের আসল প্রকাশ ঘটছে সেইখানে যেখানে শব্দ তার প্রচলিত অর্থের ঘেরাটোপ ছাড়িয়ে, অন্য কিছুর ব্যঞ্জনা দান করে। আলংকারিকেরা শব্দের এই অর্থাতিরিক্ত বিষয়ান্তরের দিকে অভিসারের নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'। এই ধ্বনিবাদের মুখর প্রবক্তা হ'লেন আনন্দবর্ধন (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী)। রমণীদেহের লাবণ্য যেমন শারীরবিত্থার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, তেমনি কবিতার 'ধ্বনি' যে অপ্রাপ্য, অশ্রুত এবং অবোধ অনুভবের জন্ম দেয় পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়ে—তাও সম্ভবতঃ বিতর্কের অতীত। কিন্তু প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় যে, ব্যঞ্জনার সাহায্যে এই যে ধ্বনি, তা কা প্রকাশ করতে চায়? কোন্ অশরীরী ভাবনার দৃশ্যপট মেলে ধরতে চায়? এর উত্তরে ধ্বনিবাদীরা বলেন, এ ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি যার পরিচয় মেলে দিতে চায়, তা হ'ল 'রস' : কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্। রসের সংস্পর্শেই অলঙ্কৃত শব্দ কবিতা হয়ে ওঠে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনুযায়ী রস বলতে বোঝায় তাকেই, যা আস্বাদন করা যায়। সাহিত্য বা কবিতারস-এর ক্ষেত্রে সেই আস্বাদনের অর্থই জরুরী হয়ে ওঠে এবং তাহ'ল শৃঙ্গার, করুণ, ক্রোধ, ধীর, হাস্য প্রভৃতি রস-এর আস্বাদ বা উপভোগ। এখন এই রস উপভোগ সম্ভব হয় অন্তর-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, ইন্দ্রিয়ের বহিরঙ্গদ্বারা নয়। এই কারণেই রস-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল, তা ভাষার দ্বারা স্পর্শ করা যায় মাত্র। তার পূর্ণ পরিচয় ঘটে যথার্থ রসিকের অন্তরে। দ্বিতীয়তঃ, শব্দের অভিধা শক্তির (যে শক্তির দ্বারা শব্দের ব্যাকরণ ও অভিধানসম্মত মূল অর্থের বোধ হয়) দ্বারা রসকে উন্মোচিত করা যায় না, অর্থাৎ রস বাক্য নয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন ব্যঞ্জনার দ্বারাই রসের বোধ সম্ভব হয়—আর এ ব্যঞ্জনা ঘটে চিত্তবৃত্তির সক্রিয়তার দ্বারা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে রসের উপাদান দুটি—একটি আসে মানব মনের 'ভাব' তথা আবেগ থেকে; এটি রসের মানসিক উপাদান। ব্যবহারিক জগতের ঘটনায় শোক-দুঃখ-কারুণ্যের আবেশে আমরা বিচলিত হই, এটা প্রত্যক্ষ। কিন্তু কবিসৃষ্ট

কাব্যের জগতের ঘটনায় যখন আমরা আপ্লুত হই, তখন যে রসের সঞ্চার হয়, তাহ'ল রসের বহিরঙ্গ। কবি তাঁর প্রতিভায়, লৌকিক শোক বা আনন্দ কিংবা করুণার সমগোত্রীয় অনুভূতি ফুটিয়ে তোলেন এক অলৌকিক বর্ণনা-কুশলতায়। এই জন্যই রসকে বলা হয়েছে অলৌকিক। বাস্তব জগতের নিয়ম রসের ক্ষেত্রে তাই খাটে না। কবির সৃষ্ট জগৎ নিয়তিকৃত-নিয়মরহিত। আলংকারিক আনন্দবর্ধন তাই বলেছেন "অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ। যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথৈব পরিবর্ততে।"

আলংকারিকেরা রসতত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ব্যাখ্যা ও টীকা সহযোগে। সেই বিস্তৃত গহন অরণ্যে পথ হারানোর প্রয়োজন আমাদের নেই। কিন্তু কবিতার চরম ছাড়পত্র যখন রসসৃষ্টি, এবং রস যেহেতু আস্বাদনযোগ্য, সুতরাং প্রশ্ন হ'ল যে এই রস আস্বাদন করে কে?

এর উত্তর দিয়েছেন প্রসিদ্ধ আলংকারিক আচার্য অভিনবগুপ্ত (খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী), তাঁর একটি স্মরণযোগ্য শ্লোকের মাধ্যমে :

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূত মনোমুকুরে। বর্ণণীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তেহত্র হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।"

এই শ্লোকে বলা হয়েছে কবিহৃদয়ের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ করেন এমন সহৃদয় ব্যক্তিদের কথা। নিরন্তর কবিতা অনুশীলনের পর তাঁদের হৃদয়, স্বচ্ছ দর্পণের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই দর্পণে কবিকৃত বাক্‌প্রতিমা, সহৃদয়ের অন্তরে মানস প্রতিমার মত প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কবিতায় যা বর্ণনা করা হয়েছে, সেই বিষয়ের মধ্যে তাঁরা একাত্ম হ'য়ে যেতে পারেন। কবিতার রস আস্বাদকের এই 'তন্ময়ীভবনযোগ্যতা' যদি না থাকে, তা'হলে সেরা কবির ফসলও পৃথিবীর ঘাটে-মাঠে-বাটে নিষ্ফল হ'য়ে যায়; কিন্তু সে নিষ্ফলতাও, বোধ করি, সাময়িক। পরবর্তী যুগের কোন রসিক হয়তো আবিষ্কারের আনন্দে তাকে উদ্ধার করে আনেন উদাসীন পৃথিবীর উন্মোচিত দৃষ্টির সামনে।

* * *

সুতরাং, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বে, কবিতার যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা সর্বযুগের জনমনোরঞ্জনের মাধ্যম বলে স্বীকৃত হবে—এ ভাবনা দুরাশা মাত্র। তাছাড়া, প্লেটো যে কারণে কবিদের তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে কারণে,—তাঁরা নির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব মেনে কবিতা লিখবেন, তাও সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে মতবাদ ও তার

উদাহরণে কবিতারূপ লক্ষ্য করা গেছে, তা আরিষ্টট্‌লের তত্ত্ব মেনে চলেনি। ষোড়শ শতকে ক্ল্যাসিক্যাল কাব্যতত্ত্ব থেকে কবিরা বহুলাংশে সরে গেছেন তাঁদের সৃষ্টিকর্মে। ইতালীয়-ফরাসী-ইংরেজী ভাষার নতুন অভ্যুদয়ে যে নতুন বাগ্‌-ভঙ্গিমার জন্ম হ'ল, তা নিজের পায়ে ভর করার জন্য নিজস্ব মাটি খুঁজে নিল। তা ক্লাসিকাল রীতিকে অভ্রান্ত বলে মানলো না। ষোলো শতকের শেষে এবং সতেরো শতকের গোড়ার দিকে শেক্‌সপীয়ারের কবিতার বিরূপ ও কঠোর সমালোচনা তার প্রামাণ্য দলিল।

কিন্তু গ্রীক ও ল্যাটিন আদর্শ কোন কোন কবিকে ছাড়ল না—প্রতিক্রিয়া হিসেবে আবির্ভাব ঘটল ড্রাইডেন ও পোপের; শেক্‌সপীয়ার বেঁচে রইলেন তাঁর নাটকের চরিত্র-চিত্রণে; কিন্তু ক্লাসিক আদর্শের তোড়ে হারিয়ে গেলেন ডান। সপ্রতিভ ও চমকপ্রদ বাগভঙ্গীর সাজানো কুশলতায় কবিতার আদর্শ স্থির করে গেলেন আলেকজান্দার পোপ।

উনিশ শতকে তারই অবধারিত প্রতিক্রিয়া দেখা গেল রোমান্টিক কাব্য আন্দোলনে। কবি ও চিত্রশিল্পী উইলিয়ম ব্লেক থেকে শুরু হ'ল তার জয়যাত্রা। শেলী ও কীট্‌সের অকালমৃত্যুতেও তার রেশ—বিশশতকের যুদ্ধবিধ্বস্ত, রাজনীতি কলঙ্কিত সভ্যতাতেও একেবারে ফুরিয়ে যায়নি,—এমনকি কবি সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড-এর Poetry is Criticism of Life--এই অমোঘ ঘোষণা সত্ত্বেও। উনিশ শতকীয় রোমান্টিক আন্দোলন এক হিসেবে কবিতার স্বপক্ষে, এবং বিপক্ষেও নানা ধ্যান-ধারণার জন্ম দিয়েছে। তার ফলে কবিরা একদিকে ক্রমশঃ ঝুঁকেছে আত্মঘোষণা তথা বিচিত্র গোষ্ঠী-বন্দনায় সামাজিক ও রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে,—অন্যদিকে স্বগত ভাষণে, প্রতীকী ব্যঞ্জনার ঘেরাটোপে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জাত আনন্দ-দুঃখ-অভিমান-প্রেম-এর অশ্রুতপূর্ব কোরাসে। এই বিবিধ উচ্চারণে, অবশ্যই রসাভাস মিলেছে, পরিশীলিত শ্রুতিতে, কিন্তু কবি-সহৃদয়েরা কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। তাঁরা স্বেচ্ছানির্বাসনে গেছেন, অথবা কবিত্বের রসে কটু তিক্ত স্বাদের প্রাবল্য অনুভব করে দূরে অন্তর্হিত হয়েছেন—তার মীমাংসা কে করবে?

যে কথা প্রথমেই বলা হয়েছে সে কথায় ফিরে আসি। সেতু ভেঙে গেছে, সাঁতার দিয়ে পারাপারের দুঃসাহস আজ আর বোধ হয়, কবিতার ক্ষেত্রে মানব সমাজে কারো মধ্যে অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কবিরা চান, এই ভাঙা সেতুর দুই প্রান্ত যুক্ত হোক। "আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল শুধাইল না কেহ"—চিরকালীন প্রেমিকের এই আর্তি, যথার্থ কোন কবির কাছে প্রার্থনীয় নয়।

ছাপাখানার আবিষ্কার কবিতার চেহারা ও চরিত্র সেই কোন যুগেই পাল্টে দিয়েছিল। উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি অথবা সুরে গান হ'য়ে ওঠার বদলে এল নিঃশব্দ-পঠন ; বিচারবোধে শ্রুতির পরিবর্তে এল দৃষ্টি। মলাটশোভিত গ্রন্থ, প্রায় দু'হাজার বছরের পাণ্ডুলিপির ঐতিহ্যকে মুছে ফেলল। কবিতায় স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতির যুগ নিঃশেষ হ'য়ে—এল বইয়ের পাতা উলটে কবিতা-অভিজ্ঞতার যুগ। মানবসমাজে কবিতার উৎস সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক উভয়েরই নানা মতবাদ ও ধারণা প্রচলিত আছে। একটা সম্ভাব্য মতবাদ এই যে কবিতা সৃষ্টি হ'য়েছিল কবির আগে। জনসমাজ থেকে উত্থিত তার গান অথবা শব্দসজ্জায় কুশলীদক্ষতা, কবিকে মানবসভ্যতার প্রথমযুগে বিশিষ্টতা দেয়নি। এই বিশিষ্টতা অর্জন করেছে সে অনেক পরে। একটি বৃত্তরেখার উপমায় বলা যায়, প্রথম যুগে কবি এই বৃত্তের মধ্যে মিশে গিয়েছিল একাত্ম অনুভবে। দ্বিতীয় যুগে সে বিশিষ্ট হ'ল ব্যক্তিত্বে, তখন সে হ'য়ে উঠল এই বৃত্তের মধ্যে একটি বিন্দু। তৃতীয় যুগে সে আরো এক ধাপ এগিয়ে, বৃত্তের পরিধিস্থ একটি বিন্দুতে নিজের জায়গা খুঁজে পেল। শেষ অবস্থায় তার এই অবস্থান হ'ল বৃত্তের বহিঃস্থ বিন্দুতে। ইংরেজী কবিতার বিভিন্ন পর্ব সম্পর্কে প্রখ্যাত সমালোচক হার্বার্ট রীড এই প্রতিতুলনা করেছেন ; যদিও, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার কবিতা সম্পর্কে এ মন্তব্য প্রযোজ্য নয়—একথা বলা চলেনা। উপরোক্ত উপমার সম্প্রসারণে তিনি বলেছেন,

> "The ballad poet is identical with the world he lives in. The humanist poet is the nucleus of his world, the focus of intelligence and intellectual progress. The religious poet lives at the periphery of his world and is in contact with the infinite universe. The romantic poet is his own universe, the world for him is either rejected as unreal or is identified with poet's own feelings." [৬]

সুতরাং কাব্যতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কবিতার ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারায় কবির সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগসূত্র ক্রমশঃই শিথিল হয়েছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে কবির পক্ষে তাঁর নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠী খুঁজে পাওয়া দুরূহ হ'য়ে উঠেছে। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে জনসংযোগের মাধ্যমগুলি (সংবাদপত্র-সিনেমা-রেডিও, এবং শেষে টেলিভিশন) মানুষের শিল্পবোধের ওপর যে

পরিমাণ দৌরাত্ম্যকর প্রভাব বিস্তার করেছে—তার হিসেবনিকেশ করা,—বিশ শতকের সত্তরের দশকের শেষে, নিতান্ত অসম্ভব গবেষণা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত নিপুণ ও পরিশ্রমী সমাজতাত্ত্বিকের পক্ষেও। মানুষের সূক্ষ্মবোধ, কল্পনাশক্তি, রুচি এবং সৌন্দর্যস্পৃহা এমন স্থূলতা অভিসারী হ'য়ে উঠেছে যে, যে সংযোগ মাধ্যম তাকে উত্তেজিত করে না, প্রবলভাবে ধাক্কা দেয় না, তাকে সে নিতান্ত আবর্জনা ব'লে মনে করতে প্রস্তুত। আজ থেকে প্রায় একশো আশি বছর আগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর Lyrical Ballads এর ভূমিকায় লিখেছেন,

> "When I think upon this degrading thirst after outrageous stimulation, I am almost ashamed to have spoken of the feeble endeavour made in these volumes to counteract it………"

আজকের যে পরিমাণ প্রচণ্ড কলকোলাহল রেডিও টিভি সংবাদপত্রে প্রায়ই ঘোষিত ও উচ্চকিত—ওয়ার্ডসওয়ার্থের সময় তার কিছুই ছিল না। ওয়ার্ড-সওয়ার্থ "Outrageous Stimulation" এর এই হৃদয়বিধ্বংসী রূপ আজ দেখতে পেলে হয়তো কবিতা লেখা ছেড়ে দিতেন। কিন্তু এখনকার তন্নিষ্ঠ কবিরা তা করেননি। "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন''—ব'লে কেউ কেউ অবশ্য স্বধর্ম ত্যাগ করেছেন, তাঁদের প্রচণ্ড চাঞ্চল্যে কবিতার আসর মাত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মানুষ তাঁদের হৈ-হল্লা জনিত দৃশ্যমুখই মনে রেখেছে, তাঁদের কবিতাকে নয়। জনসাধারণ আজ কবিতার বিষয়বস্তু হ'য়ে উঠেছে, কিন্তু তারা কবিতার শ্রোতা নয়। প্রয়োগবিদ্যা তথা টেকনোলজীর সদাবিস্তৃত প্রভাবে জনসাধারণ আজ হ'য়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক, আকারবিহীন, এককথায়, বিমূর্ত,—অনুভবের আলোয় যার অন্ধকারকে দূর করা যায় না, সংবেদনশীলতায় যাকে স্পর্শ করা যায় না, এবং কল্পনার শক্তিতে যাকে জীবন্ত করে তোলা যায় না। অথচ আমরা দেখেছি, অলৌকিক অনুভব, সংবেদনশীলতা এবং কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্র ছাড়া কবিতা কিছুতেই সম্ভব নয়।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ক'লকাতা তথা বাংলার পরিবেশ দেখার দুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। অথচ যেটুকু তিনি দেখেছেন, তাতেই তিনি ভিতরে ভিতরে জীর্ণ হয়েছেন, ক্লান্ত হয়েছেন। একটি চিঠিতে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছেন,—"আমাদের দেশের ভিড়ের মন কেবলই মাতলামি নয় তোৎলামি করে, তার প্রকাশ হয় অসম্পূর্ণ, নয়, বিকৃত—

তার অপরিসীম দম্ভ মূঢ়তা থেকে, প্রাদেশিকতা থেকে—সে জানেই না যে, সে কত অভাজন, কেননা যেখানে মানুষের চিন্তার উদার ক্ষেত্র সেখানে তার প্রবেশ নেই, তার আনন্দ নেই।……”

* * *

ছাপার অক্ষরে যা কিছু প্রকাশিত হয়, তারই সম্বন্ধে নির্বিচারে মতামত জানানোর অধিকার আছে যে কোন অক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন মানুষের—এরকম একটা ধারণা সংবাদপত্র শাসিত জনমানসে ইদানীং বহুল প্রচলিত। এই ধারণার সবচেয়ে বড় শিকার হয়েছে কবিতা। বহু-পঠনে কবিতার রূপ-রস-ব্যঞ্জনা সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা গড়ে ওঠে—কিন্তু কবিতা পাঠের অভ্যাস স্কুলে-কলেজে লাইব্রেরীতে, নানাবিধ সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ যে চোখে পড়ে,—একথা সত্যি নয়। যাঁরা কথায় কথায় কবিতা সম্পর্কে উন্নাসিক মন্তব্য ছুঁড়ে দেন তাঁরা জীবনে ক'টি কবিতা—কবিতা পাঠের আনন্দের জন্য—ভালো ক'রে পড়েছেন? অন্য পরে কা কথা—রবীন্দ্রনাথের কবিতাই বা তাঁরা কতটুকু পড়েছেন? যে বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার প্রবণতা পর্যন্ত দেখা যায়না সে বিষয় সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য শ্রুতিসুখকর নয়—অন্ততঃ কবিদের পক্ষে তো নয়ই।

কিন্তু সাধারণ মানুষ সম্পর্কেই বা বলার কি আছে—যখন শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতী ও সফল মানুষেরা এমন ভাব দেখান যে কবিতা বারবণিতাতুল্য, তার সম্বন্ধে যা খুশী ভাবা যায়, যে কোন মন্তব্যে তাকে কলঙ্কিত করা যায়, উল্টে পাল্টে দেখে যে কোন কবিতাগ্রন্থ সরিয়ে রাখা যায়। তাছাড়া সারা পৃথিবী জুড়ে আজকের কবিতা সম্পর্কে যে অভিযোগ বহুঘোষিত, সেই দুর্বোধ্যতা আজ একটি ফ্যাশানের মত দাঁড়িয়েছে। আমাদের আলোচনায় কবিত্বের স্বরূপ প্রসঙ্গে যে কথা বলা হ'য়েছে তাতে আশা করি একথা স্পষ্ট হবে যে অতিরিক্ত বস্তুবাদী মন নিয়ে কবিতার রস পাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিদিনের পরিচিত অভিজ্ঞতার যে অনাস্বাদিত ও অদৃশ্য অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, কবিরা সেই অদৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত রূপের সংবাদ আমাদের জন্য বহন করে আনেন। এক নিঃশ্বাসে টানা গল্প পড়ে যাওয়ায় অভিজ্ঞতা এবং কবিতা পড়ার অভিজ্ঞতা এক নয়। প্রখ্যাত আমেরিকান কবি আর্চিবল্ড ম্যাকলীশের একটি কবিতার শেষ দুটি লাইন এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি: “A poem should not mean। But be”—ফুল যেমন একটু একটু করে পাপড়ি মেলে তার নিজস্ব রূপে ফুটে ওঠে, রাত্রিশেষের আঁধার যেমনভাবে আলোছায়ায় রহস্য

পেরিয়ে ভোরের দরজায় পা রাখার চেষ্টা করে—এই অনন্তকালীন প্রক্রিয়া, এই স্ফুটোনোন্মুখ সাধনাই কবিতার প্রাণশক্তি। যেমন-তেমন ভাবনা চিন্তায় তাকে উপলব্ধি করা যায় না; অথচ অধিকাংশ অসহিষ্ণু পাঠক তাই করতে চান। তাঁরা যা চান তা হলো অন্ত্যানুপ্রাসযুক্ত কিছু পদ্য রচনা—প্রতিটি দেশের ভাষায় যা অজস্র লেখা হয়; তার দ্বারা কবিতায় মর্যাদা স্থির করা যায় না। নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু কিছু কবিতা-লেখকও আছেন যাঁরা স্বেচ্ছানির্বাসিত, যাঁরা আপন মাহাত্ম্যে আত্মবিস্মৃত। ভগ্নসেতু বন্ধনে তাঁদের ভূমিকা নগণ্য।

কিন্তু কবি ও পাঠক বা শ্রোতার মধ্যে যদি যোগসূত্র খুঁজে পেতে হয়—তাহলে কবিকে খুঁজে পেতে হবে তাঁর ঈপ্সিত শ্রোতা এবং পাঠক বা শ্রোতাকে হতে হবে কবিসহৃদয় যার পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে। কবিকে যেমন সব সময়ই মনে রাখতে হবে বহুল প্রচারিত পত্রিকায় বা বেতার ঘোষণায় এমন কি টি-ভির মাধ্যমে তিনি মানুষের মনকে শুধু আলতোভাবে ছুঁতে পারবেন. কিন্তু রসের প্রকাশে মানুষের মর্মে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপক চেষ্টা এই যুগে ব্যাহত হবে, কেননা জনমনোরঞ্জনের মাধ্যমে তাঁর ভূমিকা সম্ভবতঃ আর গৌরবজনক হ'য়ে উঠবে না, রাষ্ট্রনীতি অথবা রাজনীতির পৃষ্ঠপোষণা সত্ত্বেও। এবং কবিতা-অনুরাগী পাঠককেও জানতে হবে, বুঝতে হবে—কবিতা জৈব প্রয়োজনের শিল্প নয়; এই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন চাহিদা কোন আর্তি কোন আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য ব্যাকুলতা জীবনে প্রার্থিত না হ'লে কবিতা স্নায়ু-শিরা গ্রন্থিতে কিছুতেই আলোড়ন আনবে না।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করি: "...সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের একটা জায়গায় মিল নেই। সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয়। কাব্যে বচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য। অনির্বচনীয়তা সেইটাকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো। এ পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁট বেঁধে দিয়েছে ছন্দ। পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে 'যদেতৎ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব'। বাক্ এবং অবাক্ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্যবন্ধনে। এই বাক্ এবং অবাক-এর একান্ত মিলনেই কাব্য।"[৭]

কবিতাকে যাঁরা তাঁদের সীমিত বোধ্যতার ঘেরাটোপে দেখতে চান, তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কথিত "বাক্" এর বাইরে কিছুই চাইবার নেই। অর্থাৎ তাঁরা কিছুতেই "অবাক্" হতে চান না, এমনই টনটনে তাঁদের জ্ঞানের

মহিমা। এই জ্ঞানের মহিমায় শিল্প-সংস্কৃতি-সমাজ যত বেশী পরিমাণে আপ্লুত হয়ে থাকবে, ততই জীবনানন্দ দাশ কথিত 'অদ্ভুত আঁধার' নেমে আসবে মানব সভ্যতায়। তারই অমোঘ প্রতিক্রিয়ায় 'শকুন ও শেয়ালের খাদ্য হয়ে ওঠাই হবে কবি-শিল্পী-প্রেমিকের অবধারিত পরিণতি।

উল্লেখপঞ্জী

১. Collected Plays: The Elder Statesman—T. S. Eliot
Page 355

২. Great Dialogues of Plato: Translated by W.H.D. Rouse
Mentor Book: Page 400

৩. Ibid: Page 405

৪. কাব্যজিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত: বিশ্বভারতী পৃষ্ঠা ১৪

৫. কাব্যমীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য: পৃষ্ঠা ২৮-এর উদ্ধৃতি থেকে গৃহীত।

৬. The Phases of English Poetry: Herbert Read
Pages 166—167

৭. সাহিত্যের স্বরূপ – রবীন্দ্রনাথ; বিশ্বভারতী; পৃষ্ঠা ২৭

স্বরধ্বনি-শব্দ-ভাষার বিবর্তনে মানব সভ্যতা

মৃত্যুর পরবর্তী রহস্য ভেদ করার উৎসাহ মানব জাতির ইতিহাসে, তার জ্ঞানের রাজ্যে প্রথম পদার্পণ করার পর আদিমতম ঘটনা। এ রহস্যের সমাধান আদৌ হয়নি, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত্ত পর্যন্ত নিজের অস্তিত্বকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার যে বাসনা মানুষের মজ্জাগত, তা অন্য কোন প্রবৃত্তির চেয়ে কম উগ্র নয়। তারো চেয়ে বড় কথা, জীবিত মানুষ, একটা বিচিত্র ও অধ্রুব আদর্শের দিকে অসম সংগ্রামে চিরদিন ব্রতী হয়েছে এবং সেই আদর্শ হ'ল মৃত্যুর পরবর্তীকালের খ্যাতি।

"এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসিখেলায়। আমি যে গান গেয়েছিলাম, জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়"—এই গানের মাধ্যমে রচয়িতা অথবা গায়ক, গানের উর্ধ্বে তাঁর আর্তিকে মেলে ধরেছেন, বলতে চেয়েছেন, শুধু বর্তমানের শ্রোতাকে নয়—অনাগত উত্তর পুরুষকেও,—"যখন আমায় ওপার থেকে গেল ডেকে—ভেসেছিলেম ভাঙা ভেলায়…।" এবং সমস্ত শব্দ সমাহার থেকে ভেসে আসে একটিই মিনতি, "তবু মনে রেখো .." ।"

কিন্তু এ মিনতি শুধু আধুনিক যুগের মানুষের নয়—এ মিনতি সর্বকালের। তাই গুহাগাত্রে, পাথর অথবা মাটির ফলকে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানুষ আপন ইচ্ছাকে, বিচিত্র প্রতীকের সাহায্যে রূপ দিয়েছে। তখন শব্দ ছিল তার বোধ বা ধারণার অতীত, ভাষা দূর অস্ত।

তারপর সভ্যতার উন্মেষে মানুষের অভিজ্ঞতায় কবে কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির সৃষ্টি হয়েছে, সেই ধ্বনিরূপ কিভাবে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতীকরূপে চিহ্নিত হয়েছে এবং তার পরিণতিতে এক একটি গোষ্ঠীতে আদিমতম ভাষার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে—তার সর্ববাদীসম্মত ও স্বীকৃত ইতিহাস আজো লেখা হয় নি। কিন্তু ভাষার উৎস এবং মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে তার ভূমিকা কতখানি তা নির্ণয় করার মোহ, আজো এই বিংশশতকের ভাষাতাত্ত্বিকদের কাটেনি।

লিপির আবিষ্কার নিতান্তই সাম্প্রতিক, অন্ততঃ মানব সভ্যতার প্রাচীনত্বের তুলনায়। তার শুরু মাত্র পাঁচ কি ছয় হাজার বছর আগেকার ঘটনা, এবং পূর্ণাঙ্গ আক্ষরিক লিপির ইতিহাস আরো সাম্প্রতিক। এ ইতিহাসের প্রথম যুগে

দেখা যায় চিত্রলিপির উদ্ভব, অর্থাৎ পাথর বা মাটির ফলকে অঙ্কিত বিভিন্ন চিত্রাঙ্কন দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের চেষ্টা। তারপর শুরু হ'ল বর্ণমালার আবির্ভাব কাল—খৃষ্টপূর্ব ১৭৩০ অব্দ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৫৮০ অব্দ, এবং তার জন্মভূমি সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন,—এবং ওই "সেমেটিক" বর্ণমালা থেকে প্রাথমিক হিব্রু, আরবীয়, ভারতীয় এবং অন্যান্য শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটে।

কিন্তু লিপি বা বর্ণমালার উদ্ভবের আগে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীতে প্রথমে কথ্য বা উচ্চারিত ধ্বনির মাধ্যমে মানুষ ভাব প্রকাশ করেছে। সেই ভাব-প্রকাশ প্রথমে প্রকৃতির মধ্যে জাত ধ্বনি-ব্যঞ্জনাকে অনুকরণ করে সৃষ্টি হ'য়েছে ; তারপর কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে ব্যবহৃত ধ্বনি-সমষ্টি একদা স্বীকৃতি লাভ করেছে, এবং তার থেকে ক্রমে ভাষার উদ্ভব ঘটেছে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে উচ্চারিত ধ্বনি থেকে জাত শব্দ বা শব্দাবলী—বিশ্ব-প্রকৃতিতে প্রসারিত বস্তু বা পদার্থের প্রতীকের কাজ করেছে, এবং আজো বিভিন্ন ভাষায় তার কাজ তাই। বিভিন্ন শব্দ,—যেমন সূর্য, নক্ষত্র, জল, পাহাড় বিভিন্ন বস্তুর প্রতীকরূপে তাদের পরিচয় দান করেছে, তেমনি শরীরের মধ্যে অনুভূত বিচিত্র আবেগ—যেমন ভয়, ঘৃণা, ভালোবাসা, বিস্ময় প্রভৃতিও মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়া থেকে জাত হয়ে প্রথমে ধ্বনির সৃষ্টি করেছে, তারপর তা শব্দের গঠন পেয়েছে।

লিপি ও বর্ণমালার ক্রমিক উদ্ভবের ক্ষেত্রে কথ্য-ধ্বনির ভূমিকা এই কারণে বিশেষ তাৎপর্যজনক। উচ্চারিত ধ্বনির কতকগুলি চিহ্ন সর্বসম্মতভাবে প্রথমে গ্রাহ্য হয়েছিল, তারপর সেই চিহ্ন বা সঙ্কেতের ক্রমিক সজ্জা থেকে যে লিপির উদ্ভব হ'ল—তাকে ধ্বনি-লিপি বলা যেতে পারে। ভাষার ক্রমিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ধ্বনি-লিপির ভূমিকা বিস্ময়কর, এবং চিত্রলিপির তুলনায় তার অগ্রগতি, মানুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্কচালনার উন্নতিকে সূচীত করে। তার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে উচ্চারিত ধ্বনি থেকে জাত শব্দ, এক হিসেবে বিভিন্ন বস্তু অথবা মানবিক আবেগের প্রতীক। সেই শব্দ বা শব্দাবলী, আবার লিপি ও বর্ণমালায় রূপ পরিগ্রহ করল, অর্থাৎ লিপি বা বর্ণমালা শব্দের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হ'ল ; সুতরাং বর্ণমালা সমন্বিত যে অক্ষর এবং তার থেকে জাত শব্দের চেহারায় সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত তা আসলে একটি প্রতীকের অন্য প্রতীক। সোজা কথায়, উচ্চারিত শব্দ হ'ল বাইরের বস্তু বা, মানসিক আবেগের প্রতীক—লিপিতে রূপান্তরিত অক্ষর বা লিখিত রূপ হ'ল সেই উচ্চারিত শব্দের প্রতীক।

ভাষার উদ্ভবের ক্ষেত্রে এই প্রতীকের ভূমিকা স্মরণ করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে আদিম যুগে মন্ত্র-উচ্চারণ, সুর-সহযোগ শব্দের বিচিত্র বিবর্তন মানুষকে কেন এত মুগ্ধ করেছে, বা, আজো করে থাকে। এ প্রসঙ্গে লিখিত রূপ এবং কথ্যরূপের পার্থক্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

যখন গ্রামোফোন বা টেপ্‌রেকর্ডারের জন্ম হয়নি, তখন ভাষার লিখিত রূপ কথ্যরূপের চেয়ে অনেক মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল কেন না, তার দ্বারা ভাষাকে দূরে দূরান্তরে পাঠানো সম্ভবপর হ'ল। বই, পত্র-পত্রিকা এভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাতায়াত করেছে, এক দেশের মানুষের ভাবনাকে পাঠিয়েছে অন্য দেশের মানুষের মনে; এবং সবচেয়ে বড় কথা, মুখের ভাষাকে দান করেছে প্রার্থিত স্থায়িত্ব, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য, এবং কিছু ভাগ্যবান ও যশস্বী মানুষের ক্ষেত্রে কয়েক যুগের জন্যও বটে। মুখের কথা সেদিন দেশ ও কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করতে পারেনি। ভাষার লিখিত রূপ সেই অর্থে কালজয়ী। আজ বিংশ শতকের চতুর্থ পাদের শুরুতে, যখন ডিস্ক, টেপ্‌, রেডিও, ফিল্ম ও টেলিভি-শানের ছড়াছড়ি, তখন ভাষার লিখিত রূপ তথা বইয়ের এই প্রাধান্য স্বীকৃত নয়। তবে কি যে বই জ্ঞানরাজ্যে ও আনন্দ-বিনোদনের সঙ্গীরূপে একদিন বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছিল, আজ সে তার তীব্রতা হারিয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে সভ্যতার বিবর্তনে গ্রন্থের ভূমিকা এবং তার প্রসারের কথা একটু সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

মানব সভ্যতায় ধ্বনি-লিপির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠ হবার পর যখন বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীতে ভাষার লিখিত রূপের প্রচলন হ'ল, তখনো মুখের কথা, মানুষের মনের কথারূপেই প্রচলিত ছিল। এবং গাছের পাতার ওপর পুঁথিলিপি হোক, ভূর্জপত্র কিংবা প্যাপিরাস লিখন হোক—লিখন ভঙ্গিমায় মনের ভাব প্রকাশ করার বিজ্ঞান-সম্মত বাণীরূপ হ'য়েছে অনেক পরে। এ কারণে, ভাষার প্রথম যুগে তার রূপ ছিল নৃত্যপরা তথা ছন্দের তালে ও সুরের ওঠানামায় ব্যঞ্জনাময়। আধুনিক যুগে "বই" যে অবস্থায় এসেছে, সে অবস্থায় আসতে তার অনেক সময় লেগেছে; অনেক শতাব্দীর জড়তা, দাসত্ব এবং অন্ধকারের যুগ পেরিয়ে তবে নতুন যুগের দরজায় সে ধাক্কা দিতে পেরেছে।

আমরা জানি পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় মানব প্রকৃতি এবং বিশ্ব প্রকৃতির বর্ণনা ঘটেছে প্রথমে ছন্দোবদ্ধ শব্দ সমাহার তথা কাব্যের মাধ্যমে। আর সেই ছন্দোবদ্ধ কাব্য রচনা হয়েছে মুখ্যত-দেবদেবীর জয়গানে, এবং পরবর্তীকালে রাজা বা

গোষ্ঠীপতির মহিমা বন্দনায়। প্রথম যুগের লিখনশিল্পীরা বা কবিরা তাঁদের কবিত্বশক্তি তথা শব্দ-মাধুর্য, উপমা ও অলঙ্কারের প্রাচুর্যের সমাহারে আত্মনিয়োগ করেছেন শুধু রাজন্য বন্দনায়।

সে যুগ ছিল পুঁথিলিখনের যুগ। রাত জেগে, অমানুষিক পরিশ্রম করে লিপিকাররা কবির পাণ্ডুলিপি নকল করতেন, এবং সেই নকল করা পুঁথি থাকত রাজা, জমিদার কিংবা সম্রান্ত অমাত্যদের অধিকারে। কবির কাব্যের রস আস্বাদন করতেন তাঁরাই। সে কারণে তাঁদের তুষ্ট করাই ছিল কাব্য খ্যাতির একমাত্র পথ। এ প্রসঙ্গে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কাব্যজীবনের বিপর্যয় স্মরণযোগ্য। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষণা তিনি যতদিন পাননি, ততদিন, তিনি দারিদ্র্য ও দুঃখের স্রোতে ভেসে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। পরবর্তী যুগে ভারতচন্দ্রের মত কবি প্রতিভাও প্রভু-মাহাত্ম্য বর্ণনায় আপন শক্তিকে খর্ব করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেন, "অপরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হ'লে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব মিলন সঙ্ঘটিত হত; কেন না Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল।"

Knowledge এবং Art যাঁদের করায়ত্ব ছিল, তাঁরা সেই দ্বৈত শক্তিকে প্রয়োগ করেছিলেন সমসাময়িক যুগের "প্রভু" বন্দনায়। অথচ তাঁদের তুলনায় যাঁদের শক্তি ছিল অল্প, সেই অক্লান্ত "কবিয়াল"রা, রাজবন্দনার পরিচিত ও প্রার্থিত পথ ছেড়ে সমকালীন যুগকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে বিদ্ধ করে নিজেদের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে সাহিত্যের আঙিনায় উপস্থাপিত করেছেন। এ কারণে, সেই কবিয়ালদের, তথা কবিগানের পরিবেশ থেকে যিনি বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ঈশ্বর গুপ্তের চরিত্রে অথবা রচনায় পরের মনোরঞ্জন করার আত্ম-বিক্রীত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। ঈশ্বর গুপ্তই বাংলার পথিকৃৎ কবি, যিনি রাজসভার আনন্দ বিনোদনের পথ ছেড়ে বাইরের তৃষ্ণার্ত জনগণের দিকে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে ভরা কবিতায় এবং "সংবাদ প্রভাকরের" পাতায় পাতায়।

* * *

সাবধানী পাঠক নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন যে ভাষার লিখিত রূপের মাধ্যমে চিন্তাধারার যে বিরাট পরিবর্তন ঘটল, তার বিপ্লবী ভূমিকা মূলতঃ ও মুখ্যত যে

শক্তির কারণে, তাহ'ল ছাপাখানার আবিষ্কার। ভাষার পরবর্তী লিখিত রূপ তথা গ্রন্থ আর কোন সৌখীন ধনী বা রাজন্যবর্গের খেয়াল খেলনা রূপে বন্দী হ'য়ে থাকল না—তা ছড়িয়ে পড়ল ধীরে ধীরে উৎসাহী এবং জিজ্ঞাসু মানুষের সমাবেশে। এর সঙ্গে আর যে বস্তুটি ভাষার প্রবল অগ্রগতিকে প্রচণ্ড গতি দান করল তাহ'ল কাগজ তৈরীর ইতিহাস এবং তার উৎপাদনের প্রাচুর্য। পুঁথি লিখনের যুগে এবং অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক নকল লিপিকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার সুযোগ পেতেন মুষ্টিমেয় কিছু ধনী বা জমিদার পুত্রেরা। সে যুগের জ্ঞানচর্চার যে মহিমা মাঝে মাঝে গুণীজনেরা প্রকাশ করে থাকেন, তা যে আসলে আষাঢ়ে গল্প, একথা এখন স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। শুধু তাই নয় সে যুগের পণ্ডিতেরা জনসমাজে বিদ্যার প্রসারের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে শ্লাঘা প্রকাশ করতেন এবং জ্ঞান বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় একটা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইতেন।

ছাপাখানার প্রচলনের সময় এই অচলায়তন একদিনে ভাঙেনি, আস্তে আস্তে তার পাথর-দরজা উন্মুক্ত হয়েছে, এবং পনের দশকের শেষে গ্রন্থ প্রকাশের বিষয়ে প্রথমে ঐতিহাসিক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মুদ্রাকরেরা—আজকের বহুল প্রচারিত 'প্রকাশক' গোষ্ঠীর আবির্ভাব তখনো হয়নি। এ প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের মুদ্রাকর ক্যাক্সটনের নাম স্মরণীয়। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে ইতালীর মুদ্রাকরেরা, সমসাময়িক যুগের রেনেশাঁসের প্রগত চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, সাংস্কৃতিক জীবনে পুনর্জীবন এনেছিলেন। তুলনায় ইংরাজ মুদ্রাকরেরা ছিলেন রক্ষণশীল, এবং তার অন্যতম কারণ ছিল আর্থ-সামাজিক। এলিজাবেথান যুগেও ইংরাজ সাহিত্যিকরা মনে করতেন বই ছাপিয়ে সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা মর্যাদা হানিকর। হাতে লেখা নকল-পাণ্ডুলিপির মহিমা সম্পর্কে তাঁদের মনে তখনো এক বিচিত্র মোহ ছিল—তাঁরা পুরনো যুগের কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে সেই নকল করা পাণ্ডুলিপি রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন। সাধারণ মানুষদের কাছে তাঁদের রচনা প্রচারিত হোক—এ তাঁরা চাইতেন না। স্বয়ং শেক্সপীয়ারও এই পুরনো ধারণার বশবর্তী ছিলেন। সমসাময়িক যুগের স্মরণীয় কবি জন ডানের (যাঁর প্রেমের কবিতা আজ চারশো বছর পরেও অম্লান) জীবিতাবস্থায় তাঁর কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। বই প্রকাশের বিবর্তনে মুদ্রাকরদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। তাঁরা যে মুদ্রণক্ষেত্রে প্রাথমিক যুগে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন তা নয়—বই ছেপে প্রকাশ করেছেন, তা বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন, লেখকদের যেমন লিখিয়েছেন, তেমনি নিজেরাও বই লিখেছেন। ষোড়শ শতাব্দী হ'ল গ্রন্থ জগতে মুদ্রাকরদের

যুগ। তারপর থেকে গ্রন্থ প্রকাশনা জগতে আর একটি বিশেষ শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল এবং তারপর থেকে বইয়ের ব্যবসায় বিপ্লব ঘটে গেল। এই শ্রেণীই অধুনা বহুল প্রচারিত ও পরিচিত প্রকাশক বা পাব্‌লিশার।

ষোড়শ শতাব্দীতে মুদ্রাকর ও প্রকাশকের সহাবস্থানে গ্রন্থ প্রকাশে শুরু হ'ল বৈচিত্র্য। সতের শতকে প্রকাশকরা স্বতন্ত্র উদ্যোগে বইয়ের ব্যবসায় উদ্যোগী হলেন, এবং সেই যুগের ঐতিহাসিক ধারা অনুযায়ী (যে যুগে বণিকদের আভিযাত্রিক মানসে জলদস্যুতা, লুণ্ঠন, কাঁচামালের সন্ধানে দেশবিদেশে যাত্রা ছিল স্বাভাবিক) তাঁরা লেখকদের পাণ্ডুলিপির বিনিময়ে যৎসামান্য অর্থ দিয়ে তার সর্বস্বত্ব কিনে নিতেন। এ ঘটনাকে সাহিত্যিক দস্যুবৃত্তি অবশ্যই বলা যায়, এবং আমাদের দেশে উনিশ শতকে তার উদাহরণ নিশ্চয়ই মিলবে।

যাই হোক, যু.গর চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ প্রকাশের সংখ্যা ক্রমশ যেমন বেড়ে উঠল, তেমনি বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ প্রকাশকদের আবির্ভাব ঘটল. এবং আঠারো শতকে ছাপার হরফ, কাগজ, মুদ্রণ পারিপাট্য আরো উন্নত হ'য়ে উঠল! ফরাসী বিপ্লবের পর সামগ্রিক ভাবে যখন চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটে গেল, তারই জের হিসেবে উনিশ শতকের শুরু থেকে গ্রন্থ প্রকাশের স্বর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটে গেল রোমান্টিক কবি ও সাহিত্যিকদের যুগান্তকারী প্রতিভা সৃষ্টিতে, আর—গ্রন্থ প্রকাশের নতুন জয়যাত্রা তার সঙ্গে পা মিলিয়ে কয়েকটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের জন্মদান করল। তাদের মধ্যে "মারী" ' কন্‌ষ্টেবল্‌" "লংম্যানস্‌" প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই স্বর্ণযুগের আবির্ভাব আমাদের 'সোনার বাংলা'য় ঘটেছে অনেক পরে। তার একমাত্র কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের সমষ্টিগত প্রসারে আমাদের বিদ্বজ্জন-সমাজ খুব বেশী অগ্রণী হননি।

আমাদের বাংলা দেশেও পুঁথি ও তার হাতে লেখা নকলের প্রচলন স্বয়ং বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় ছিল. এবং মাত্র একশো পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও যে দেশে মাত্র শতকরা একজনের অক্ষর পরিচয় ছিল কি না সন্দেহ সেখানে পুঁথির মাহাত্ম্য বর্ণনা তো হাস্যকর। সঙ্গত কারণেই "পুঁথিগত বিদ্যা" কথাটি যে আজো ব্যঙ্গার্থে প্রচলিত হয়ে আছে, তা অবশ্যই অকারণে নয়। এদেশে মুদ্রণকর্ম ও বই প্রকাশকের প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য এ প্রসঙ্গে নিবেদন করি। ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানায় প্রথম বই ছাপা হয় ১৫৫৬ সালে; ১৫৭৭ সালে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় ভাষায় (মালয়ালাম) ভারতীয় মুদ্রণযন্ত্রে প্রথম বই "ক্রীষ্ট বন্নকনম্‌" কোচিনে ছাপা হয়। বাংলা ভাষায় রোমান অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বই ছাপা হয়

১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন শহরে—তার নাম "কৃপার" শাস্ত্রের অর্থভেদ—এবং ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ, এটি অবশ্য ইংরেজী ভাষায় লিখিত। এ প্রসঙ্গে আরো একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল শেষে, মুদ্রণকর্মে কুশলী বাঙালী পঞ্চানন কর্মকারের কৃতিত্ব ও বাংলা অক্ষর ছাপার জন্য তাঁর অবিস্মরণীয় দান। এইসঙ্গে উনিশ শতকের প্রারম্ভে আর একজন কৃতী বাঙালীর নাম স্মরণীয়। একাধারে মুদ্রক-প্রকাশক সাংবাদিক লেখক এই উদ্যোগী বাঙালীর নাম গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। স্বাধীন ব্যবসায়ী রূপে তিনি বাংলা বই প্রকাশ করেছেন, বিক্রি করার জন্য প্রথম দোকান করেছেন, প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন—এবং উনিশ শতকে জ্ঞান চর্চার অন্যতম সর্তরূপে তিনি প্রথম বাংলা সংবাদ পত্র প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থপ্রেমিক ক'জন বাঙালী তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন? সাহিত্যপ্রেমিক হিসেবে বাঙালী বই ভালোবাসে বলে, তার একটা খ্যাতি আছে। কিন্তু বাংলা গ্রন্থ প্রসারে যাঁদের অক্লান্ত শ্রম সাধনা ধৈর্যের ফলে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ মর্যাদা লাভ করেছে, সেই পূর্বস্থরীদের মাহাত্ম্য-বর্ণনায় বাঙালী সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক-গবেষকরা যে কিছুটা কৃতজ্ঞ তার প্রমাণ পাওয়া যায়না।

* * *

গ্রন্থ-প্রকাশনার প্রথম যুগে মুদ্রক-প্রকাশকদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল—একথা যেমন সত্য, তেমনি পরবর্তীকালের প্রকাশকরা অধিকাংশ সময় যে যোগ্য ও প্রতিভাবান লেখকদের সমাদর করে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন—একথা অবশ্য বলা যায়না। উনিশ শতকের গ্রন্থ প্রকাশের দৈন্য এমনই প্রকট ছিল যে স্বয়ং বিদ্যাসাগরের মত মানুষকেও মুদ্রণ ও প্রকাশনা কর্মে অত্যন্ত গভীরভাবে সংযুক্ত থাকতে হয়েছিল। বাংলার ছাপাখানা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের অবদান স্মরণীয়। মুদ্রণ ও প্রকাশনায় যে স্বাধীন ও নির্ভীক মনোবৃত্তি একান্তভাবে কাম্য ছিল, মানব চরিত্রের সেই দুর্লভ দ্বৈত গুণ, বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কার মধ্যে এমন পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়? এই কারণে সেদিন যথেষ্ট সাহসী ও উদ্যমী এমন প্রকাশকের দেখা মেলেনি যাঁরা বাংলা গ্রন্থ জগতে বিপ্লব ঘটাতে পারতেন। মধুসূদনের মত কবি প্রতিভার গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য রাজপোষকতা সেদিন অন্যতম সর্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভার গ্রন্থ প্রচারে এগিয়ে আসেন নি কোন স্বাধীন প্রকাশক—এবং এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। তাই দেখা যায় বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শন যন্ত্র" নামে প্রেসের প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মসমাজের "ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র"—এবং রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বভারতী" প্রকাশনা—সে যুগের স্বাধীন প্রকাশকদের

রুচি ও সাহিত্যবোধের নিষ্ফল অহমিকা রূপে ইতিহাসে লেখা থাকবে। যে স্বাধীন মানসিকতার জোয়ারে ইউরোপের প্রকাশকেরা গ্রন্থ জগতে বিপ্লব এনেছিলেন সমগ্র উনিশ শতক এবং বিংশ শতকের প্রায় প্রথম পাদ পর্যন্ত তার কোন চিহ্ন আমাদের দেশে দেখা যায় না। অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে তার অনেক পরে। প্রকাশনার ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি ঘটলেও—এবং শিক্ষাবিস্তার ব্যাপক হ'লেও বাঙালী পাঠকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়েনি, এবং পাঠকের ভূমিকা গ্রন্থ-প্রকাশের ক্ষেত্রে যেটুকু ব্যাপ্ত হয়েছে, তাও ঘটেছে অতি সম্প্রতিকালে। গ্রন্থ প্রকাশনার সে এক অন্য ইতিহাস।

নিরাসক্ত অন্ধকার থেকে উচ্চারণ

কবিতাবিষয়ক ভাবনাকে সুসংহতভাবে আধুনিক পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করা—সম্ভবতঃ কবিকর্মের মত দুরূহ ও সাধনাসাপেক্ষ। বর্তমান যুগে মানুষ যখন বস্তুবাদী চিন্তাধারায় মোহগ্রস্ত, তখন কবিতা-বিষয়ক আলোচনার উপযোগিতা যে একান্ত সীমিত, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই কারণে বর্তমান লেখক কবিতার ধর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাত্বিক আলোচনা পরিহার করে একান্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবনাকে মেলে ধরতে আগ্রহী।

রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য দিয়েই শুরু করা যাক। "বাংলা ভাষা পরিচয়" গ্রন্থের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ভাষার সীমানাহীন সম্ভাবনা প্রসঙ্গে বলেছেন,—"হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায়না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়াভাঙার কাজ।···এক দিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আর একদিকে অস্পষ্ট কথারও।" এই অস্পষ্ট কথার ইশারাই হ'ল কবির মূলধন।

কথাটা নতুন নয়। আজ থেকে একশো বছরেরও অধিক কাল পূর্বে কোলরীজ বলেছিলেন, কবিতা পাঠের যথার্থ আনন্দ পাওয়া যায় তখনই, যখন তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। প্রাচীন পারস্যদেশীয় একটি প্রবাদবাক্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—"যে কথা তুমি বললে সে কথা তো আমি কান দিয়েই শুনলাম, কিন্তু যা তুমি বলতে গিয়েও বললে না, সেই কথা ভাবতে ভাবতে আমার সারা জীবন কেটে গেল।"

তা হলে যে প্রশ্ন কবিতারসিকদের কাছে জরুরী হয়ে ওঠে তা হ'ল এই—কবিচিত্তে যে সব অস্পষ্ট ভাবের ব্যঞ্জনা ভীড় ক'রে কথা বা শব্দের মাধ্যমে রূপ পরিগ্রহ করে, তাই কি কবিতার ভাষা? যে ব্যথা বা অভিমান কখনো কোনো মনের মানুষকে হারানোর জন্য, কিংবা কোন কোন মুহূর্তে অজস্র হৃদয়-ঐশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য—তাই কি কবিতার ভাববস্তু?

কবিতার ইতিহাসের পাতায় যাদের স্বাক্ষর কালজয়ী, তারা অধিকাংশই প্রেমিক। সম্ভবতঃ প্রেমই কবিতার অন্যতম প্রেরণা—সেই প্রেম বিশেষ বা নির্বিশেষ রমণী প্রেম থেকে বৃহত্তর মানব সমাজে বিকীর্ণ হলেই কবিতা মহত্তম

শিল্পের মর্যাদা পায়। এই প্রেম যে কবিচিত্তের নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি, সেকথা বিভিন্ন যুগের কবির বাগ্‌ভঙ্গিমা লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায়।

অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রে কবিতা অনেক জাগর মুহূর্তের যন্ত্রণার কারণ-স্বরূপ, —আবার অনেক যন্ত্রণার উপশমও বটে। এ যুগে এ কথা আরো সত্য এ কারণে যে আজ অনেক কবিই তাঁর সাধনায়—শ্রম, সময় এবং রক্ত জল করা অর্থও ব্যয় করে থাকেন। আসল কথা হ'ল, আত্মপ্রকাশের দুর্বার মোহ, অনেক কবির উত্থান,—এবং কে জানে,—পতনের কারণ। এই আত্মপ্রকাশের মোহও আসলে ভালোবাসার উল্টোপিঠ বলে মনে হয়। মানুষ যেমন প্রেমিকার কাছে নিবেদন করে তার দুঃখ বা আনন্দ,—বলে; "তুমি আমার অনুভবের অংশ গ্রহণ কর" — কবিও তেমনি সারা পৃথিবীকে ডেকে বলতে চায় দুঃখের বা যন্ত্রণার কথা, অথবা আনন্দের কথা। যে কবির অনুভূতির জগৎ ব্যক্তিগত হয়েও নৈর্ব্যক্তিক, সেই কবিই মানুষের বুকে স্থায়ী আসন পাতে।

বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, স্পষ্ট উচ্চারণ থেকে প্রতীকী ইঙ্গিতে, মোহগ্রস্ত আসক্তি থেকে নিরাসক্ত মনোভাবে উত্তরণই যথার্থ কবিকর্মের অভিজ্ঞান। দুঃখের বিষয় এ যুগের অধিকাংশ কবিই এর বিপরীত আচরণে বিশ্বাসী। বিশেষ বিশেষ ভাবনার প্রতি তাঁদের আত্মনিবেদন আত্মবিশ্বাসে অকারণ মোহ এবং খ্যাতির প্রতি তাঁদের আসক্তির অবধারিত প্রবণতা—যে কোন কবিতা রসিকের মনোবেদনার কারণ।

কারো কারো ধারণা, কবিরা সৃষ্টিকর্মে মগ্ন হবার সময় নিজের হৃদয়কে নিরাবরণ উন্মোচনে মেলে ধরেন, কিন্তু অন্য সময় তাঁরা মুখোস পরে থাকেন। কথাটা কতখানি সত্য, তা বলা কঠিন কিন্তু এ যুগে এই ধারণাকে প্রমাণিত করার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা কবিকুলে দৃশ্যমান নয়। তাছাড়া, আজকের বিড়ম্বিত ও উৎকেন্দ্রিক জীবনে কোনটা মুখোস আর কোনটা মুখশ্রী, সে বোধ সহজলভ্য নয়। অথচ কবিকর্মে নিজেদের অত্যধিক মাত্রায় সপ্রতিভ, বলে প্রমাণ করার বালকসুলভ প্রচেষ্টার মধ্যে এ যুগের বেশ কিছুসংখ্যক কবিরা যে মোহগ্রস্ত, তার উদাহরণ অনেক মনোযোগী কবিতা পাঠক হয়ত লক্ষ্য করেছেন।

শিল্পকর্মকে জীবনের চেয়ে বেশি মূল্য দিতে বর্তমান লেখক প্রস্তুত নয়— কবিতাকে তো নয়ই। হ'তে পারে, কারো কারো ক্ষেত্রে শিল্পকর্ম জীবনের একটা ঈর্ষণীয় ভগ্নাংশ। কিন্তু কোন বিতর্কের ঝুঁকি না নিয়েই এ কথা বলা যায় যে, জীবনের জন্যই শিল্প, শিল্পের জন্য জীবন নয়। এ কথা বলার আরো প্রয়োজন

এই কারণে যে, মানুষের জীবন আজ কেন্দ্রচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত,—এক কথায় অসংহত বলেই, জীবন আমাদের কাছে শিল্পের সৌন্দর্য, সুক্ষ্মতা এবং সামগ্রিকতায় মহিমান্বিত নয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই আমরা জীবনের অপূর্ণতা ভরাবার জন্য শিল্পকর্মে তথা কবিতার মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজি, আশ্রয় পেতে চাই। অন্য শিল্পীর চেয়ে এই অবস্থায় কবির ভূমিকা অনেক বেশী বিপজ্জনক, কেন না তিনি নিজের হৃদয় দিয়েই পরিদৃশ্যমান জগতের কথা বলেন; তাঁকে তাঁর অনুভবের সত্যকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করতে হয়। চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীত-শিল্পীর পক্ষে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া যত সহজ, কবির পক্ষে হয়ত, ততটা সহজ নয়। কারণ ছেঁড়া তারে যেমন সুর বাজে না, বিবর্ণ ক্যানভাসে যেমন ছবি ফোটেনা, ক্ষণভঙ্গুর পাথরে যেমন ভাস্কর্যের অনুপম সুষমা প্রকাশিত হয় না—তেমনি ক্ষুব্ধ, পরাজিত এবং আহত হৃদয়ে কবিতার ঐশ্বর্য ফোটেনা। কবির হৃদয়ই যে তাঁর শিল্পের প্রসারিত তার, উজ্জ্বল ক্যানভাস এবং কঠিন পাথর। সেখানেই একই সঙ্গে সঙ্গীত চিত্রকলা—ভাস্কর্যের মিলিত ব্যঞ্জনা! "আমার সকল কাঁটা ধন্য করে গোলাপ হয়ে উঠবে"—আজকের কবিদের কাছে এই ধরণের সেন্টিমেণ্টাল ভাববিলাস, গ্রহণীয় নয় কেননা এই যুগ আত্মবিকিরণের যুগ, আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। আত্মদহন বা আত্ম-বিসর্জন এ যুগে আত্মহত্যারই সামিল।

নিরাসক্তি খাঁটি আর্টিষ্টের অন্যতম লক্ষণ, কবির ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু চিরকালীন কবি চরিত্রের সঙ্গে এই যুগের ভাবমানসের মধ্যে যে প্রচণ্ড বিরোধ, তার ফলশ্রুতিরূপে এযুগে কবির চৈতন্য দ্বিধাবিভক্ত। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ এই যুগে কবিরাও নিজেদের সর্বদাই জনসমক্ষে প্রচারিত করতে চান। সম্ভবতঃ অন্য কোন যুগে কবিদের মধ্যে খ্যাতির জন্য এত কাঙালপণা দেখা যায়নি। এযুগের কবিরা নিরাসক্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন একথা হয়তো যথার্থ নয়, বরং বলা উচিত কবি-চরিত্রের অন্যতম শক্তিকে দিনের পর দিন অবজ্ঞা করে, উপেক্ষা করে, নিজেদের সৃষ্টির প্রতি তাঁরা অবিচার করেছেন।

এই মন্তব্যের দ্বারা একথা বলা বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয় যে কবিরা আত্মতৃপ্তির জন্য লিখবেন। কথাটা তা নয়। সমস্ত প্রকার শিল্পীর মধ্যে কবিদের মধ্যেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণা অত্যন্ত প্রবল। "আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ"—একথা ব্যর্থ প্রেমিকের হতে পারে, কিন্তু সার্থক কবির নয়। কিন্তু যদি দেখা যায়,—আত্মপ্রকাশের দুর্বার তাড়নায় কবি

স্বয়ং তাঁর সৃষ্ট কবিতার সামনে দাঁড়িয়ে, কবিতার মধ্যে অবিরাম নিজের ছায়া প্রক্ষিপ্ত করছেন, তাহলে সেটা কবিতার পক্ষে দুর্ঘটনা।

একথা সকলেরই জানা আছে যে কবিচিত্ত অত্যন্ত সংবেদনশীল। সূক্ষ্ম ভাবনার ছায়াপাতেও হয়তো কবি প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হতে পারেন। কিন্তু এই আন্দোলন কবিমানসের অভিব্যক্তির উপলক্ষ্য মাত্র—লক্ষ্য হল সেই ভাবনাকে নির্মোহ চেতনায় শব্দসজ্জার ইঙ্গিতে ও বাক-প্রতিমায় প্রকাশ করা। যথার্থ শিল্পী-চেতনা, সংসারের বিচারে হয়তো একটু নিষ্ঠুর, কিন্তু এই অপ্রিয় কথনের দায়ভাগ গ্রহণ করেই তাঁকে নিজের সৃষ্টিকর্মে উত্তরণের পথে অগ্রসর হতে হয়। কবির ভূমিকাও তাই হওয়া বিধেয়।

ঠিক এই কারণে কবিকে হতে হয় নিরভিমান। সংসার, সমাজ, দেশ,—তাঁর প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শন করে—তাহলেও অভিমানে আহত হওয়া কবিচরিত্রের আন্তরিক প্রকাশ নয়। এই সাময়িক দুঃখের পটভূমিকায় তিনি, বড় জোর, লর্ড বায়রণের ভাষায় বলতে পারেন—"**I have not loved the world, nor the world me—/but let us part fair foes……**", কিন্তু তার বেশী কোন ক্ষোভ বা অন্তর্দাহ প্রকাশ করা, কবিমানসের বিরোধী। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আত্মপরিচয় গ্রন্থের এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বীণাপাণির বীণায় তার অনেক। কোনোটা সোনার, কোনোটা তামার, কোনোটা ইস্পাতের। সংসারের কণ্ঠে হালকা ও ভারী, আনন্দের ও প্রমোদের যত রকমের সুর আছে সবই তাঁর বীণায় বাজে। কবির কাব্যেও সুরের অসংখ্য বৈচিত্র্য। সবই যে উদাত্তধ্বনির হওয়া চাই এমন কথা বলিনে। কিন্তু সমস্তের সঙ্গে সঙ্গেই এমন কিছু থাকা চাই, যার ইঙ্গিত ধ্রুবের দিকে, সেই বৈরাগ্যের দিকে; যা অনুরাগকেই বীর্যবান ও বিশুদ্ধ করে।"

যে অনুরাগ বীর্যবান ও বিশুদ্ধ, তার মধ্যে ভালোবাসার পাত্রকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকেনা—এই কারণেই তা আসক্তিহীন। এইখানেই প্রেমিকের তুলনায় কবির জিত ; আসক্তির মুগ্ধতায় প্রেমিক আত্মবিলোপে বিলীন, নিরাসক্তির অসম শক্তিতে কবি জয়ী। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে আজকের যুগের কবিতায় এই জয়ের আনন্দ বহুশ্রুত নয়। এই দুর্ভাগ্য শুধু কবিতার নয়, কবিতা-পাঠকদেরও, এবং বলতে বাধা কি—স্বয়ং কবিদেরও।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্য

তরল ভাবালুতা বাঙালী মানসিকতাকে ঠিক কোন্ সময়ে গ্রাস করেছিল, আজ বিংশ শতকের চতুর্থ পাদের প্রারম্ভে তার হিসেব-নিকেশ করা দুরূহ। অথচ এই দেশই নব্য-ন্যায়ের শ্রীক্ষেত্র বলে বহু ঘোষিত এবং কীর্তিত। সম্ভবতঃ মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, জীববিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বের সমষ্টিগত এবং সাংগঠনিক গবেষণার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে যুক্তি তথা নির্মোহ চিন্তা-ভাবনায় বাঙালীর অনীহা কেন এমন মজ্জাগত। অতি সম্প্রতিকালে এক শ্রেণীর ভাষা-ব্যবসায়ীদের দোর্দণ্ড প্রতাপে বাংলা গদ্য মুখ্যতঃ হাটের ব্যাপারীদের ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁদের বাক্‌চাতুর্য যে অচিরেই বাংলা গদ্যের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হ'তে চলেছে,—এই আশঙ্কায়, যাঁর নির্মোহ গদ্যভঙ্গিমার কথা স্মরণ করছি, তিনি হ'লেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

মুখ্যতঃ কবিরূপে তিনি খ্যাতিমান হ'লেও সুধীন্দ্রনাথের গদ্য অভিনিবেশ সহকারে বহুপঠিত হওয়া উচিত ব'লে আমার ধারণা। ভাষার প্রাঞ্জলতা সম্পর্কে যাঁদের পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা, মোহগ্রস্ততার পর্যায়ে পড়ে, একমাত্র তাঁরাই সুধীন্দ্রনাথের গদ্য তথা প্রবন্ধ সম্পর্কে বিতৃষ্ণা পোষণ করবেন। আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে প্রকাশিত, তাঁর "স্বগত" নামক গ্রন্থের "সূচনা"য় তিনি লিখেছিলেন, "বন্ধুমহলে আমার লেখা দুর্বোধ্য বলে নিন্দিত। হিতৈষীদের বিচারে সংস্কৃত আর ইংরেজী ভাষার বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে আমি যে অস্পৃশ্য রচনারীতির জন্ম দিয়েছি, বঙ্গভারতীর নাটমন্দিরেও সে হরিজনের প্রবেশ নিষিদ্ধ…।" যে অভিযোগ সুধীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে বহুশ্রুত, সেই একই অভিযোগ শোনা গেছে তাঁর গদ্যরচনা সম্পর্কেও। এর কারণ অনুসন্ধান করলে একটি তথ্যই স্পষ্ট হয়ে ওঠে,—তা হ'ল যুক্তি ও বিচারবোধের কষ্টিপাথরে আপন অভিজ্ঞতাকে যাচাই করার দৃষ্টিভঙ্গী অথবা শক্তি বাঙালী মানসিকতায় অল্প। আমার স্থির ধারণা, সুধীন্দ্রনাথ তাঁর পরিশীলিত যুক্তিবোধ, বিদেশী সাহিত্য অবগাহন করার দ্বারা যত না আয়ত্ত করেছিলেন, তার চেয়ে বেশী পরিমাণ আয়ত্ত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত এক নিরাসক্ত, প্রজ্ঞাবান এবং স্থিতধী পুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।

যে দুটি বৈশিষ্ট্যের জন্য সুধীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবী করতে

পারে, সে দুটি হ'ল, তাঁর ভাষা এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য। প্রথমটির মধ্যে পরিচিত শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়যুক্ত ব্যবহার, শব্দসজ্জার অভিনবত্ব এবং বাঙালী পাঠকের অনভ্যস্ত বাক্যরীতি। দ্বিতীয় স্বাতন্ত্র্য হ'ল তাঁর গদ্য রচনার বিষয়,—যা সেদিনের শিক্ষিত বাঙালীর কাছে খুব উপাদেয় ছিল বলে মনে হয় না। তাছাড়া "বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী" সুধীন্দ্রনাথ বিশ্ব-সংস্কৃতির নানা সমস্যা ও আদর্শ সম্বন্ধে যে নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসে অগ্রসর হয়েছেন, সেই অগ্রগতি সেদিনের সাধারণ বাঙালী সমাজের কাছে অনায়ত্ত ছিল বলেই তাঁর চিন্তাধারা তাদের কাছে অবোধ্য বলে মনে হয়েছে।

সুধীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে তিনি আবাল্য যুক্তির ভক্ত। এই ভক্তি যে অহৈতুকী ভক্তির তুল্যমূল্য সে কথা বলা বাহুল্য। তিনি নিজেও এই তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন যে যুক্তির বিস্তার বাঙালীর স্বভাববিরুদ্ধ। তবুও জাতিগত এই স্বভাব-বিরুদ্ধ কর্মে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই দার্শনিক বোধিতে স্থিত হ'য়ে যে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ, দৃষ্টিকে যে শুধু অস্বচ্ছ করে তা নয়, বিচারশক্তিকেও বিমূঢ় করে। তাঁর দুটি প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ "স্বগত" এবং "কুলায় ও কালপুরুষ"-এর প্রবন্ধাবলীতে তিনি যে সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিশীল মননের পরিচয় রেখেছেন তা যে কোন স্থিতধী চিত্তের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

যুক্তিপ্রবণ মন যে কোন সমস্যার সর্বত্রসঞ্চারী দিক বিবেচনা করতে অভ্যস্ত। এই সামগ্রিক চেতনা তার প্রকাশ মাধ্যমকে প্রক্ষিপ্ত করে, ব্যবহারিক তথা পথ-চলতি মানুষের অভিজ্ঞতার গণ্ডীর বাইরে। অতি পরিচয়ের নৈকট্য ছাড়া যাঁদের বোধ ও বুদ্ধির জড়তা ভাঙে না, তাঁদের কাছে এই অপরিচয় কিংবা অজানা তত্ত্বসন্ধান পথ হারানো বালকের মত অবস্থার তুল্যমূল্য। এছাড়া বিশেষ বিশেষ সংস্কৃত শব্দ তিনি এমন অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন যে শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের প্রতি যাঁদের আকর্ষণ কিংবা মমতা নেই,—তাঁর লেখার প্রায় প্রতি অনুচ্ছেদে, মাঝে মাঝে থমকে যাওয়া তাঁদের পক্ষে অনিবার্য অভিজ্ঞতা। উদাহরণ স্বরূপ—"ফলত মহাকর্ষের আইনষ্টাইনকৃত সঙ্কেতে ন্যূটনী বোধসৌকর্য নেই; এবং প্রথমোক্তের মত সংক্ষিপ্ত সৌকুমার্যের স্বপ্ন সৌচিককেই সাজে, বস্তুনিষ্ঠের ধ্যান ধারণা অন্য রকমের—" এই বাক্যের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথের দুটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, একটি হ'ল ওই বিশেষ, অপরিচিত শব্দসজ্জা, এবং অধীত জ্ঞানের নানা প্রসঙ্গজাত উল্লেখ। অর্থাৎ শুধু শব্দব্যবহার নয়, জ্ঞানকর্মেও তিনি এমন উচ্চাঙ্গে অধিষ্ঠিত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ যে,—নানা বিষয় সম্পর্কে

যাঁদের পঠন-পাঠন অত্যন্ত সীমিত, তাঁদের পক্ষে সুধীন্দ্রনাথের রচনা অবশ্যই দুরূহ।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল তার গতি। এই গতি সঙ্গীতের স্বরসপ্তকের পঞ্চমের সঙ্গে তুলনীয়। ভঙ্গিমায় তিনি যে ভারসাম্য রেখেছেন শব্দ ব্যবহারে, শব্দসজ্জায় এবং বাক্যবন্ধনে, তাতে তাঁর স্বরগ্রাম মাঝে মাঝে মধ্যমে নেমে এলেও, সপ্তমের স্বরে উচ্চারণ তাঁর পক্ষে নৈব নৈব চ। তাঁর গদ্য পড়তে হলে পাঠকের ধৈর্য অসাধারণ হওয়া বিধেয়; স্বরধ্বনির উত্থান-পতন কিংবা বক্তব্য ভঙ্গিমায় নাটকীয়তা যেন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। যিনি তাঁর রচনায় রস পেয়েছেন, একমাত্র তিনিই বুঝবেন যে রচনাশৈলীকে নির্দিষ্ট স্বরগ্রামে বেঁধে জ্ঞানরাজ্যে অবাধ বিচরণ করার শক্তি, একমাত্র প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব। গদ্যভঙ্গীর এই বন্ধন এক হিসেবে তাঁর চরিত্রের লক্ষণ যা পরিমিতিবোধে শুধু শাণিত ও একাগ্র নয়, উজ্জ্বল এবং সপ্রতিভও বটে। তাঁর বক্তব্য রীতিতে বিশৃঙ্খলা এবং ঢিলে ঢালা ভাব কোথাও দেখা যায় না। প্রতিটি বাক্য যেন তিনি প্রাসঙ্গিক অভিধার মূল্য পরিমাপ করে ব্যবহার করতেন। গদ্যশিল্পের এমন নিখুঁত আর্টিষ্ট বাংলা সাহিত্যে বিরল—একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে উক্তি তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় তিনি বলেছেন, "...গদ্যে সুধীন্দ্রনাথ মননের আর্টিষ্ট। তাঁর লক্ষ্য লেখার দিকে, পাঠকের দিকে নয়।" যিনি সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী খুঁটিয়ে পড়েছেন, তিনিই বুঝবেন এ মন্তব্য কতখানি অভ্রান্ত। এই "লেখার দিকে" দৃষ্টি দেওয়ার ফলে লেখক তাঁর রচনায় বিদ্যুৎচকিতভাবে এমন প্রসঙ্গান্তরে গেছেন উপমার জন্য অথবা উদাহরণের জন্য, যে পাশ্চাত্যদর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে উৎসাহ ও সাধারণ জ্ঞান না থাকলে তাঁর রচনার মহত্ত্ব উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন হবে।

সুধীন্দ্রনাথের দৃষ্টি পাঠকের দিকে নিবদ্ধ না থাকলেও বাঙালী-পাঠকের মজ্জাগত স্বভাব সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট অবহিত ছিলেন। নিজের লেখা যে পাঠক সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য তা তিনি জানতেন। বাংলা গদ্য রচনা সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান প্রবন্ধ "উক্তি ও উপলব্ধি" পাঠ করলে, এ প্রসঙ্গে তাঁর ভাবনা চিন্তা কিছুটা ধরা পড়ে।

এই প্রবন্ধটির শুরুতেই তিনি বলেছেন, "সাহিত্য সাধনায় সাধ ও সাধ্যের সামঞ্জস্য দুর্ঘট বলে, আমার লেখা যদিও অবোধ্য, তবুও আমি পড়তে ভালোবাসি

প্রাঞ্জল রচনা। তবে সারল্যের অভিধা আপেক্ষিক ; এবং প্রকার ও প্রকারীর অভেদই যেহেতু শিল্প সৃষ্টির মূল সূত্র, তাই স্বল্পাঙ্গ ভাষা রূপকথার পক্ষে যতই উপযোগী হোক না কেন, অনুরূপ উপায়ে জটিল বিষয়ের বিবৃতি স্বভাববিরুদ্ধ তথা ভ্রান্তিজনক।"* এই মন্তব্যের মধ্যেই সুধীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার নির্মিতি তথা সৃষ্টির চাবিকাঠি নিহিত। "কুলায় ও কালপুরুষ" গ্রন্থের নানা স্থানেই তিনি নিজ রচনার দুর্বোধ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু "বাঙালীর ঋজু বাক্যবন্ধ যে তার অলস চিত্তবৃত্তির সাক্ষ্য"—এ কথা জানাতে তিনি আজীবন চেষ্টা করেছেন, এই কঠিন প্রসঙ্গ নিয়ে বারংবার ভেবেছেন, কিন্তু যুক্তির কঠিন শৃঙ্খলায় নিবেদিত সুধীন্দ্রনাথ, তথাকথিত লোকপ্রিয় গদ্যলেখক হ'তে চাননি। এক্ষেত্রে তাঁকে শব্দ-শিল্পের অত্যন্ত পরিশ্রমী প্রতিভা যেমন বলা যায়, তেমনি চিন্তার সর্বত্রসঞ্চারী দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাঁর আভিজাত্যে অটল, এ কথাও সমান সত্য।

হয়তো এও সম্ভব যে, প্রথম জীবনে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন এবং তাঁর পিতৃদেব, বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাবে, সংস্কৃত ভাষা এবং তার ধ্বনি-মাধুর্য সুধীন্দ্রনাথের মনে যৌবন কাল থেকেই গেঁথে গিয়েছিল। তার সর্বাত্মক প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি। কিন্তু বাংলা গদ্যকে তিনি যে কঠিন শৃঙ্খলা ও যুক্তির ভিত্তিতে স্থাপিত করে গিয়েছেন, এই ঐতিহাসিক তথ্য বিংশ সাহিত্যের ইতিহাস যদি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ না করে, তা হ'লে অমার্জনীয় অকৃতজ্ঞতার দায়ভাগ তার ওপর বর্তাবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভাষাকে প্রাঞ্জল করার বিষয়ে যে সুধীন্দ্রনাথ ভাবিত ছিলেন তাঁর ওই "উক্তি ও উপলব্ধি" নামক প্রবন্ধে লিখিত বুদ্ধদেব বসুর গদ্য সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায়। বুদ্ধদেব বসুর সাবলীল লেখার এমন অকুণ্ঠ প্রশংসা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হ'য়েছে। সুধীন্দ্রনাথ নির্মোহ যুক্তিবাদী বলে সমসাময়িক লেখককে এমন অজস্র সাধুবাদে নন্দিত করেছেন, এবং সেই সঙ্গে এও বলেছেন, "অন্ততঃপক্ষে আমি জানি যে তাঁর ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা অনির্বচনীয় ; এবং আমার লেখায় তাঁর পরিচয় খুঁজলে, সন্ধানীর নৈরাশ্য অনিবার্য। কারণ আমার মন অন্তর্মুখী ও দৃষ্টি বিকল ; এবং অভিলাষ সত্ত্বেও বহির্জগতের ব্যূহভেদ আমার সাধ্যে কুলায় না। সম্ভবত সেইজন্যে বুদ্ধদেব বসুর বিষয়াশ্রিত প্রতিভা আমাকে এতখানি টানে ; এবং তাঁর একাধিক ত্রুটি—যথা উচ্ছ্বাসের পশ্চাদ্ধাবন,

* কুলায় ও কালপুরুষ, পৃ. ৭৫

গদ্য-পদ্যের বিরোধভঞ্জনে ঔদাস্য, অথবা ইংরাজী বাচনিক পদ্ধতির হুবহু অনুবাদ—আমাকে যেমন পীড়া দেয়, তেমনি বিস্ময় জাগায় তাঁর অবাধ, অনায়াস ও সমান্তরাল ভাবনা বেদনা।"

বুদ্ধদেব বসুর রচনা সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের এই প্রশংসা তথা ব্যজস্তুতির মধ্যে দিয়েই সুধীন্দ্র-মানসিকতার স্বরূপ ধরা পড়ে। তিনি তাঁর বক্তব্যবিষয় সম্পর্কেই যে মোহহীন কিংবা বিগতস্পৃহ তা নয়, নিজের শক্তি ও কৃতিত্ব সম্বন্ধেও একইভাবে ভাবিত। আত্মপ্রসঙ্গে তার এই অসাধারণ মোহমুক্তি কোন কোন প্রবন্ধে বৈষ্ণব-সুলভ বিনয়রূপে প্রতীয়মান হ'লেও, অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু পাঠকও তার মধ্যে নিরভিমান আন্তরিকতার স্পর্শ খুঁজে পাবেন। এই নির্মোহ অনাসক্তি তাঁর গদ্যের শারীর গঠনে, মানবদেহের স্নায়ু-শিরা-গ্রন্থির মতই এমন অচ্ছেদ্য, যে,—একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা ভাবাই যায় না। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য জনপ্রিয় না হবার এটিও একটি বড় কারণ,—কেননা আমরা জানি তাৎক্ষণিক আবেগে বিচলিত হওয়া বাঙালী চরিত্রের মস্ত বড় লক্ষণ। আসক্তি এবং আলস্যের দ্বৈত সঙ্গীতে বাহবা দেওয়ার মধ্যে বাঙালী মানসিকতা আপন ধর্ম জীবনের অন্য ক্ষেত্রে শুধু নয়,—সাহিত্যেও বারে বারে প্রকাশ করেছে।

সুধীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্যের যথার্থ পরিচয় লিপিবদ্ধ করার স্পর্ধা আমার নেই, এবং সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অত্যুৎসাহী কিছু উন্নাসিক সাহিত্য-প্রবক্তাদের সমধর্মীও আমি নই। বাংলা ভাষার সামান্যতম প্রেমিক হিসেবে,—অতি সম্প্রতিকালে ভাষার ব্যবহার নিয়ে যে স্বাধিকার প্রমত্ততাশুরু হ'য়েছে, তা বেদনার্দ্র চিত্তে উপলব্ধি করে, সুধীন্দ্রনাথের গদ্য সম্পর্কে লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি, এই মাত্র। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে পরিমিতি বোধের যে অভাব মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি, যুক্তি ও শৃঙ্খলার পরিবর্তে আপ্তবাক্য নিক্ষেপ করার যে পাণ্ডিত্য সুলভ উষ্মার আভাস পেয়েছি বিশেষ বিশেষ পত্র পত্রিকায়—সেই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালী পাঠকের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছি এক সপ্রতিভ অথচ পরিশীলিত রুচিতে বিনম্র সাহিত্যিকের সাহিত্যবোধ ও বুদ্ধির অপার বিস্তৃতির প্রসঙ্গের দিকে। এই প্রসঙ্গের পুনরালোচনায় লাভ শুধু ভাষাশিল্পীদের নয়, পাঠকদেরও বটে। কেননা এই বিষয়ে ভাবিত এক প্রতিভাবান গদ্যশিল্পীর সাধনা হৃদয়ঙ্গম করলে তাঁরা, অর্থাৎ পাঠকরা, উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ভাষা নির্মাণের যে সৌধদর্শনে তাঁরা প্রায়শই মূর্চ্ছা যান নানা গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনায়—তার ভিত্তিভূমি কঠিন মাটি, না চোরাবালি ?

কৃতার্থ দোহার

তিরিশের দশক থেকে আশির দশকের পরিসরে পঞ্চাশ বছরের সেতুর মধ্যে সাংস্কৃতিক জগতে ফাটল জমেছে অনেক। তার কিছু দৃশ্যমান, কিছুটা হয়ত' অদৃশ্য। বিষ্ণু দে-র কৃতিত্ব এইখানে, যে—এত বছরের ব্যবধানে তিনি আজো শুধু আধুনিক নন, সমসাময়িকও বটে। সেই কতদিন আগে—আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'চোরাবালি'র ভূমিকায় লিখেছিলেন, ..."চিত্তবৃত্তি নিরোধেই যেমন আত্ম-সমাহিতি আসে; তেমনি সাময়িক নির্ভর ঘুচিয়ে স্বগত আবেগে পৌঁছাতে পারলেই কবিতা সার্থক হয়। আমার বিশ্বাস বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহে এই আর্যসত্যের অমর্যাদা ঘটেনি ; এবং সকল কর্ম-প্রবৃত্তির মত তাঁর কবিপ্রতিভাও অবস্থা গতিকেই জাগে বটে, কিন্তু সে-উত্তেজনার তাড়নে তিনি আত্মজীবনী লিখতে বসেন না, এমন একটা ব্যাপক পরিস্থিতি খোঁজেন, যাতে শুধু স্বকীয় অনুভূতির স্বাক্ষর থাকে না, অনুরূপ অভিজ্ঞার আরো অনেক স্তর বিনা বিবাদে প্রশ্রয় পায়।"

টি এস এলিয়টের মন্ত্রশিষ্য হিসেবে বিষ্ণু দে বাংলা কবিতায় যে জোয়ার এনেছেন, তা শুধু এলিয়টসুলভ ভাষ্যেই যে বোঝা যায় তা নয় ; তাঁর কবিতার মধ্যেও তার অজস্র উদাহরণ ছড়ানো রয়েছে। একান্ত অসাবধানী পাঠকও তাঁর প্রথম কবিতা গ্রন্থ উর্বশী ও আর্টেমিস (১৯২৯—১৯৩৬)—এর কবিতাবলীর মধ্যেও কবিপ্রতিভার সেই নৈর্ব্যক্তিকতার সন্ধান পাবেন, যা এলিয়টের কাছে কবিতার অন্যতম প্রধান শর্ত বলে গণ্য ছিল।

তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ "চোরাবালি'র মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগকে নিরাসক্ত ভাবে কবিতার শরীরে তথা শব্দমাধ্যমে মেলে দেওয়ার স্বাচ্ছন্দ্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এবং বাঙালী কবির আবেগ যে বিষয়কে কেন্দ্র করে, অন্য-প্রসঙ্গে সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ফূর্তি পায় না,—সেই প্রেম সম্পর্কেও তাঁর চপলতায় কিছুটা ব্যঙ্গ, এবং কিছুটা উদাসীনতাও চোখে পড়ে। যেমন, "অভ্যাস, শুধু অভ্যাস, প্রিয়ে তাই তো আসি / তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে / অভ্যাস শুধু অভ্যাস, ভালো তাই তো বাসি / সহজেই পেশা, তাই তো আসি / তোমার শাড়ির ছটায়, কথায় কথায় হাসি—/না হ'লে ঝঞ্ঝা ফেলত যে সারা জীবন ঘিরে।"

শুধু প্রেম নয়, উচ্চ-মধ্যবিত্ত সমাজের বিলাস-ব্যসন-আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক—সমস্ত কিছুকেই বিষ্ণু দে সেই সমসাময়িক যুগের বিক্ষিপ্ত, অস্থির পরিবেশের মধ্যেই অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখে, কবিতার ভাষায়,—বলা উচিত, কবিতার পরিভাষায়—রূপান্তরিত করেছেন। এই রূপান্তরে বিষ্ণু দে-র ব্যক্তিগত অনুভব শিল্পীর নিরাসক্তির আড়ালে রয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব চেতনা, সংবেদনশীলতা, আবেগ, সব কিছুই শব্দের শরীরে রূপ পেয়ে পাঠকের মর্মে পৌঁছে যাচ্ছে—"তুমি চলে গেলে মরণমারীচ মায়াবীর ডাকে মূক / বধির ওষ্ঠাধরে / তারপরে এল রণমন্থনে দূর বিদেশের নারী / কালো সন্ধ্যায় দিলে শ্বেতবাহু দুটি—/স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি।"

যে কথা আগে বলেছি সে কথায় ফিরে আসি। বিষ্ণু দে-র কবিতার ক্যানভাস খুব বড় মাপের। এই প্রসারিত পটভূমির নেপথ্যে রয়েছে তাঁর নৈর্ব্যক্তিকতা,—যা ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-শোক-অস্থিরতা, এবং সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর মধ্যে যবনিকা টেনে দেয়। যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা জানেন যে, এই দ্বৈতভূমিকায় স্থির ও আত্ম-প্রত্যয়ী হয়ে থাকা কত কঠিন। চিত্রকর' ভাস্কর, স্থপতি এমন কি সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষেও যা স্বতঃসিদ্ধ—অর্থাৎ আত্মবিলোপকারী ভূমিকা,—তা কবির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। বিষ্ণু দে-র মত প্রতিভার পক্ষেও এ ব্যাপারটি সহজ ছিল না। তা যে ছিল না, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর কবিতার লঘু চাপল্যে,—মাঝে মাঝে কবিতার মধ্যে **Parenthesis**-এর মত রবীন্দ্রনাথের কবিতার পংক্তি যোজনা করার প্রয়াসে, এবং পরিহাসের স্বাচ্ছন্দ্যে।

বিষ্ণু দে-র কবিতার তিনটি বৈশিষ্ট্য পাঠক হিসাবে আমার কাছে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে হয়েছে। তার প্রথমটি হ'ল ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য, দ্বিতীয়টি হ'ল বিষয়ান্তরে গমন করার অনায়াস-কুশলতা, এবং দীর্ঘকবিতা রচনার পরিশ্রমের মধ্যে সাবলীলতা। এই গুণত্রয়ের উৎসে রয়েছে তাঁর কাব্যভাবনা-বিষয়ে সচেতন এবং আবেগহীন কুশলতা। আবেগকে সংহত করে রাখলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে যে নিপুণ প্রকাশ সম্ভব, তা 'চোরাবালি' গ্রন্থের 'ঘোড়সওয়ার' কবিতার পাঠকমাত্রেই জানেন। আরো কয়েকটি উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট করা যায়—"কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়? কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ / সারাদেশময় তাঁবু বয়ে কত ঘুরব? পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়ব?" অথবা—"যাই বল তুমি, পরগাছা নই বটে। পিপুলে না হোক, শালে অন্তত উপমা / পাথুরে মাটির লাল নীরসতা উৎসে / তবুও সবুজ মাথায় সরস পল্লবে / এ ঋজু কঠিন জীবন নয়কো শূন্য।"

আমার মনে হয় বিষয়ান্তরে কবিতার ভাষাকে অবলীলাক্রমে ছড়িয়ে রাখার কৃতিত্বে লুকিয়ে আছে বিষ্ণু দে-র কবিত্বের প্রাণশক্তি। চটুল প্রেম হোক বা রোমান্টিক 'অ্যাগনি' হোক,—তার বর্ণনায় তাঁর কাব্যভাষা যেমন গতিময়,—তেমনি অতীত ইতিহাস হোক কিংবা সমসাময়িক জীবন—তা ২৫শে বৈশাখ হোক কিংবা রবীন্দ্রনাথের নামে চেতনার উত্তরণ হোক—তিনি সমান কুশলতায় কবিতাকে তার যথাযোগ্য ভূমিতে প্রোথিত করেছেন।

দীর্ঘ কবিতার প্রসঙ্গে কবিতার সচেতন বাঙালী পাঠক হিসাবে, বিষ্ণু দে-র 'জল দাও' কবিতাটি অনেকেই স্মরণ করবেন। সে স্মরণ অবশ্যই অহেতুক নয়। কবিতাটির ভিতরে-বাইরে, সর্বত্র-ইতিহাস-ভূগোল-প্লাবিত মানুষের জীবনযাত্রার মিছিলের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি বোধহয় কান পেতে শোনা যায়। কিন্তু আরো একাধিক দীর্ঘ কবিতা তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটির মধ্যে বিশেষ বিশেষ অংশের প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন ছন্দে—অর্থাৎ তার মধ্যে অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ সকল অর্কেষ্ট্রার মত, আমাদের উৎকর্ণ শ্রুতিতে বিচিত্র রসের ফোয়ারা ঝরিয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিগত ভালোমন্দ লাগার প্রেক্ষিতকে, কবিতা-বিচারে যদি ত্রুটি বলে গণ্য করা না হয়, তাহলে বিষ্ণু দে-র একাধিক দীর্ঘ কবিতার মধ্যে 'অন্বিষ্ট' শীর্ষক কবিতাটি সেরা বলে মনে হয়। 'আমার অন্বিষ্ট তাই / অণুর সংহতি / আমূক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই / সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙ্গে দিই জীবনে ছড়াই / হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিষাদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ / অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই "।

কিন্তু কবিচরিত্রের মুক্তি কোন্ পথে, সেই তর্কে না গিয়েও আমরা যে কথা বিংশ শতকের আশির দশকে এসে বুঝতে চেষ্টা করি, তাহ'ল বিষ্ণু দে কথিত নৈর্বক্তিকতা, যার প্রভাবে তিনি কবিত্বের স্বরূপ অন্বেষণে ভ্রমণ করেছেন চিত্রশিল্প-ভাস্কর্য-সংগীতের বিস্তৃত ও ব্যাপক অভিজ্ঞতায়। বাংলা সাহিত্যে কিছু নতুন জাতের, নতুন মেজাজের, নতুন অভিজ্ঞতার কবিতা-ই শুধু বিষ্ণু দে-র অবদান নয়—শিল্পসাহিত্যের প্রশস্ত আঙিনায় সঞ্চরণ ছাড়া কবিত্বের সংবেদনশীলতা যে প্রখর হ'তে পারে না,—এই মর্মান্তিক উপলব্ধির চেতনা,—তাঁর অন্যতম সাংস্কৃতিক দান,—যা আমাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

অরুণ মিত্রের কবিতা

রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের বাংলা কবিতার আলোচনা ক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট ধারা অনুসরণ করা হয়েছে, তা ইদানীংকালে কবিতারসিক পাঠকসমাজ, সমালোচক এবং তরুণ কবিমানসের মধ্যেও সংস্কারের মত অচ্ছেদ্য হ'য়ে উঠেছে। এই বিশেষ ধারায় কয়েকজন কবির প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আমাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। মনে হয় তার বাইরে অন্য কোন কাব্য-মানসিতাকে প্রশ্রয় দিতে আমরা যেন প্রস্তুত নই।

এই ধরণের একদেশদর্শিতা, তথা একচক্ষুহরিণ-প্রতিম দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন নয়। তবে আমাদের দেশে কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে এই একদেশদর্শিতা মহাকল্লোলের কোলাহলে বিগত চারদশক ধরে বারংবার ঘোষিত হয়েছে। ফলে কয়েকটি বিশিষ্ট কবিকণ্ঠের বাণী চাপা পড়ে গেছে, ওই ঘোষণার সম্মিলিত শঙ্খ-বাদ্য-বংশী-ধ্বনির সম্মিলিত কলরবে। এই অশ্রুতকণ্ঠ কবিদের অন্যতম হ'লেন অরুণ মিত্র।

অরুণ মিত্রের কবিতা আলোচনার পটভূমি হিসেবে উপরোক্ত মন্তব্য অত্যন্ত মূল্যবান বলেই বর্তমান প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস। কবিতার ব্যাপক বিচরণক্ষেত্র পরিহার করে যেদিন থেকে স্বয়ং কবিরা আত্মপ্রচার ও আত্মঘোষণার সঙ্কীর্ণ ঘেরাটোপকে আশ্রয় করেছেন, সেদিন থেকে কবিবিশেষের খ্যাতি, নাম ও প্রচণ্ড মহিমার চাপে কবিতার সহজ-স্বচ্ছন্দ-সুন্দর শরীর তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। অরুণ মিত্র সম্পর্কে আলোচনা, একহিসেবে কবিতাশিল্পকে তার যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সামান্যতম প্রচেষ্টা। কবিতারসিক হিসেবে বর্তমান প্রাবন্ধিক এই প্রচেষ্টাকে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেছেন এই কারণে যে অরুণ মিত্র বয়সে প্রবীণ (তাঁর জন্মসাল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ) এবং সেজন্য আশা ছিল, এই পরিণত মানসের কবিসম্পর্কে কিছুটা আলোচনা হয়তো হবে।

কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। সম্ভবতঃ তাই ইদানীংকালে তিনি খুব কম লেখেন—বা কদাচিৎ তাঁর কবিতা চোখে পড়ে।

১৯৬৯ সালে একটি পত্রিকার উদ্যোগে পরিচালিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "আমার মধ্যে হয়ত আর ততোটা 'ক্রিয়েটিভ এনার্জী' নেই। তাছাড়া

কবিতা লিখতে গিয়েও আজকাল পিছিয়ে যাই। এর সার্থকতার কথা ভাবতে গেলেই ক্লিষ্ট বোধ করি। সাধারণভাবে কবিতা লোকে কম পড়ে—বিক্রিতো খুবই কম। এর আর 'কম্যিউনিকেশন ভ্যালু' নেই, পাঠকের সঙ্গে সংযোগটা হারিয়ে গিয়েছে। তাই আত্মপ্রকাশের আনন্দও পাই না কবিতা লিখে। বেশি কেউ না পড়লে কি আর আকর্ষণ থাকে লিখবার?"*

অনেক প্রবীণ কবিই কম লেখেন—কিন্তু অরুণ মিত্রের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যে তত্ত্ব ও তথ্য উন্মোচিত হয়, তাহ'ল এই যে কবি হিসেবে বৃহত্তর পাঠকসমাজ ও কবিতারসিকদের কাছে তাঁর যে স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল, তা পূর্ণ হয়নি। হয়তো এ প্রত্যাশাপূরণের ইচ্ছা অনেকের ভাগ্যেই সফল হয় না. কিন্তু অরুণমিত্রের কবিতা সম্পর্কে, কবিতা-সমালোচক তথা বাংলা কবিতা আন্দোলনের মুখর প্রবক্তাদের নীরবতা লক্ষণীয়। এই নীরবতা তথা "Also ran" সূচক মন্তব্য আমরা লক্ষ্য করেছি অজিত দত্ত এবং বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতার আলোচনা ক্ষেত্রেও।

অরুণ মিত্রের প্রথম কবিতাগ্রন্থ "প্রান্তরেখা" প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে। অবিভক্ত বাংলার সেই বিক্ষুব্ধ ও করুণ দিনের ঐতিহাসিক দলিল রচনা করেছিলেন সেদিনের অনেক কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ।

স্বাভাবিক কারণেই অরুণ মিত্রের কবিতা সেদিন উচ্চকিত হয়েছিল। কমিউনিষ্ট আন্দোলনে বিশ্বাসী কবি তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেছেন,—'এখন প্রহর গোনো/উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত/কড়া-কড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার'/ দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;/মানুষেরা হুঁশিয়ার!/লাল অক্ষরে লটকানো আছে ছ্যাখো / নতুন ইস্তাহার।" (লাল ইস্তাহার)

কিন্তু কণ্ঠ উচ্চকিত হ'লেও অরুণ মিত্র সেদিন কবিতাই লিখেছিলেন, 'শৌখীন ছায়া যবনিকা টানে দীর্ঘতর/তপ্ত ভ্রমণ অচল তবে? /দীর্ণ সময় পালক ছড়ায় প্রতিক্ষণে,/ফেননিভ ছোঁয়া শয্যা ছেয়ে। আঙুলে আঙুলে রক্তিম ছিল কী আগ্রহ—।সে আদি পর্ব লুপ্ত কবে!" আসলে যেখানে মিছিল মিলেছে জনস্রোতে'; কিংবা "বিদ্রোহী স্মৃতি পট-ভূমিকায় আগুণ আঁকে,' অরুণ মিত্র কবিতায় সেখানে স্বচ্ছন্দ হ'তে পেয়েছিলেন সেদিন—কারণ জনজীবনের ব্যাপক অস্তিত্ব ও জীবনবোধ তাঁকে প্রথমাবধি প্রভাবিত করেছে,--এবং এ প্রভাব অভিজ্ঞতার জারকে জারিত হয়ে আরো দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে।

এই দীপ্তির ঝলক আমরা উপলব্ধি করি তাঁর "উৎসের দিকে" কাব্যগ্রন্থের অসামান্য কবিতাবলীতে।

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত (পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৫৭) "উৎসের দিকে" গ্রন্থটি নানাকারণে বাংলা কবিতায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ছন্দবৈচিত্র্যে, বাগ্‌ভঙ্গিমায়, আঙ্গিকের কুশলতায়, অরুণ মিত্র যেন তাঁর কবিমানসের উত্তরণ ঘটিয়েছেন এই গ্রন্থে। কবিচিত্তের শাণিত ও পরিশোধিত প্রকাশভঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামী মমতা ও বিশ্বাসের সততা। একারণে বক্তব্যবিষয় ও আঙ্গিকের এমন সফল ও সুন্দর মিশ্রণ ঘটেছে যে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলি, সম্প্রতিকালের উৎকেন্দ্রিক কবিতাচর্চার দিনে, কবিতাশিল্পে উৎসাহী পাঠক ও তরুণ কবিদের অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত। উদাহরণ সহযোগে একথা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ব্যক্তিগত ভাবনাব অনুরণন মেলে কবি বলেন, "একদিন কাদা থেকে পা দুখানা জোর ক'রে উপরে উঠে এসেছিলাম।হাস্যকর বসতি দু'পায়ে দ'লে।নিজের তৈরী ধাপ বেয়ে উঠে এসেছিলাম। "আমার সেই সিঁড়িভাঙার কাহিনী মহৎ কাহিনী।দুটো মুঠোয় দুটো কাঁধে বাঁকানো কোমরে আমার ভারবহনের সে ছবি মহৎ শিল্প···" (সীমান্ত)

এই বক্তব্যে একটা জিনিষ খুব স্পষ্ট—তাহ'ল কবির ব্যক্তিগত উচ্চারণ আত্মগত ভাবনার ঘেরাটোপে বন্দী নয়,—তা, Melodramatic monologue এর মত নিজের সুখ-দুঃখের চারপাশে সীমাহীন বৃত্ত রচনা করে না; বরং সেই বৃত্তের কোন এক বিন্দুতে এসে উল্কাপ্রতিম স্পর্শক রেখায় নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করে পরিশ্রমে, রক্তাক্ত সংগ্রামে, সর্বোপরি মানবিক মহত্বে। কিন্তু এই সংগ্রামী উত্তরণ যে একটি কবিমানসের,—নীরস ও শুষ্ক চৈতন্যের নয়, তা বোঝাবার জন্য কবি বলেন,—"শিশুর কান্নার ঘর/গড়া হয় বুকে বুক রেখে।আদিবাস লগ্নে/চোখে চোখে/বলা হয় একটি জীবন্ত ভাষা / বিদ্যুতের মতো বাঁকা চোরা, / ঘুমভরা আঁধার সুষমা/দুরন্ত সাড়ায় রুক্ষ/বিচ্ছুরিত মশালের মতো,/পৃথিবীর দেউলিয়ামাঠে/একটি বিপন্ন ঘর গড়া হয় বুকে বুক রেখে।" (শিশুর কান্নার ঘর)

আসলে অরুণ মিত্র কবিতার মাধ্যমে মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বের ব্যাপক চেহারা মেলে ধরতে চেয়েছেন পরিপূর্ণ কবিতার ভাষায়; তিনি যে মানুষের উৎকেন্দ্রিক বাস্তব অবস্থায় আর্ত ও ক্লিষ্ট এবং তার বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনে উন্মুখ—একথা যেমন বিস্মৃত হননি; তেমনি, তাঁর প্রকাশ মাধ্যম যে কবিতা, কবিতার

ছদ্মবেশে রূঢ় ও উদ্দীপ্ত ঘোষণা নয় – একথা ও তিনি ভোলেননি। যে শিল্পকর্মে তিনি আত্মনিবেদিত, সেই শিল্পের প্রতি সুগভীর প্রত্যয় তাঁকে সেই আশ্চর্য প্রজ্ঞা তথা স্থিতধী প্রতিভা দান করেছে, যার ফলে কবিতার বিষয় ও কবিতার আঙ্গিক, প্রথমে তাঁর কাব্যচেতনায় ও পরে প্রকাশিত কবিতায় একাত্ম হয়ে উঠেছে।

প্রসঙ্গ ও প্রকরণের মধ্যে কোনটির ওপর আপেক্ষিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত –পূর্ব উদ্ধৃত "অন্যমনে" পত্রিকার সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, টেকনিক বলুন, "ফর্ম বলুন, আমার কাছে তা সব সময়েই সেকেণ্ডারী। এই অর্থেই যে, কবিতার ছাঁচ বা পদ্ধতি কবিতার বক্তব্যের স্থান নিতে পারে না, তাকে শুধু সাহায্যই করতে পারে। ... · আমার মনে হয় প্রসঙ্গ ও প্রকরণকে আলাদা করা যায় না। 'কণ্টেণ্ট'কে জড়িয়েই 'ফর্ম'। এবং লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুসারেই এটা ঠিক হয়। আমি তো কোনো কোনো সময় ছন্দে লিখতে গিয়ে দেখি জোলো গছে তখন গদ্যে চলে আসি। বক্তব্য নিরপেক্ষভাবে আগে থেকে সঙ্কল্প করে নিয়ে ফর্ম নির্বাচন হয় না।"

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেবার একমাত্র কারণ, "উৎসর দিকে" কবিতা গ্রন্থের মনোযোগী পাঠকের মনে কবির বক্তব্যভঙ্গী তথা ফর্ম সম্বন্ধে নানা জিজ্ঞাসা বা ভাবনা মনে আসতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে "উৎসের দিকে" গ্রন্থে অরুণ মিত্র ফর্ম ও কণ্টেণ্টের মিলন ঘটিয়েছেন কুশলী কবিত্বের প্রতিভায়। উদাহরণ স্বরূপ "দুপুরের সূর্য" শীর্ষক ছোট্ট চার লাইনের কবিতায় কবি, প্রকরণ বক্তব্য বাক্-প্রতিমা (Image) প্রভৃতির এক আশ্চর্য সমন্বয় সৃষ্টি করেছেন,—"দুপুরের সূর্য গুঁড়িয়ে গেল আর আমি অনুভব করলাম/তোমার স্পন্দন থমথমে রাতের মতো/তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া/অনুভব করলাম।"

নিছক গদ্যভঙ্গীতে কবিতার নির্যাস উন্মোচিত করার সার্থক প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করেছি রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা"য়। কিন্তু সেখানে মাঝে মাঝে ফর্মকে ছাপিয়ে কণ্টেণ্ট তথা বক্তব্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রমানসের কারুণ্যে, কোমলতায় ও অসাধারণ বৈরাগ্যের মহত্ত্বে। গদ্যভঙ্গীতে সার্থক কবিতা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কিন্তু তাঁর কবিতাতেও বক্তব্যের ঘোষণা উচ্চকিত; সে ঘোষণা মনকে চকিত করে, উদ্দীপ্ত করে, কিন্তু রসিক পাঠকের অস্তিত্বের মূল ধরে টানে না, হৃদয়ের গভীর প্রান্তকে আলোড়িত করে, রহস্যে উত্তীর্ণ করে না। অরুণ মিত্রের গদ্যকবিতা সেই পরিপ্রেক্ষিতে অপেক্ষাকৃত সার্থক—তিনি যখন বলেন, 'ভেবেছিলাম আমরা বাঁধ হব অন্ধকার প্লাবনের মুখে, কিন্তু বালির মত ধুয়ে

গেলাম। তোমার চোখে তাকিয়েছিলাম, সাড়া পেলাম না। সে প্রান্তরে আমার ডাক মিলিয়ে গেল। কোনো অশ্রুর গণ্ডী দিয়েও তুমি তাকে ঘেরোনি। ...সকাল এল। আমাদের সদর দরজার কাছে শিউলির বরফের রাশ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে। কবে একে হটানো যাবে ?.. এখন আলোর স্ফটিকে কত নির্বাসিত মুখের ছায়া। তাদের সকলের স্তব্ধ শ্বাসের চাপে এই স্তব্ধতা কি কাটবে না ? হে বন্ধ্যা, তোমার গর্ভে যন্ত্রণা এবার নড়ুক।" (রাতের পর দিন)

কিংবা "এ জ্বালা কখন জুড়োবে" কবিতায় অরুণ মিত্র যখন বলেন,—"এ জ্বালা কখন জুড়োবে ? আমার এই বোবা মাটির ছাতি ফেটে চৌচির। উঠোনের ভালোবাসার ভোর এক মুঠো ছাই হয়ে ছড়িয়ে যায় শুকনো লাউডগার মাচায়,...শুধু ভাসা-ভাসা কথার শূন্যে লেগে থাকে এক জলমোছা দৃষ্টি দুপুরের সুষ হয়ে। কোথায় সে আকাঙ্খাকে পোষবার সংসার, ভবিষ্যৎকে আদর করবার সংসার।..."—

তখন, "কন্টেন্টকে জড়িয়েই ফর্ম'—অরুণ মিত্র কথিত মন্তব্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে পারা যায়।

গদ্যভঙ্গীতে প্রকাশভঙ্গীর স্বতস্ফূর্ততা অরুণ মিত্রকে ব্যক্তিগতভাবে সম্ভবতঃ আবিষ্কারের আনন্দদান করেছিল। ফলে পদ্যের পরিচিত ভঙ্গীতে কবিতা লেখার সময়, একটি অলক্ষ্য প্রভাব কবিমনে কাজ করেছে। এবং অরুণ মিত্রের কবিতায় এক আশ্চর্য অনন্যতা দান করেছে। এই অনন্যতার পরিচয় পাই "উৎসের দিকে" গ্রন্থের আরো কয়েকটি কবিতায়—যেমন, "আমি বিষের পাত্র ঠেলে দিয়েছি/তুমি প্রসন্ন হও। /আমি হাসি আর কান্নার পেছনে আমার প্রথম স্বপ্নকে ছুঁয়েছি/তুমি প্রসন্ন হও।...আমি হাটে হাটে ভেসে এসে থেমেছি/মাটিতে পা গেড়ে দিয়েছি/ফুসফুসে ভরে নিয়েছি মহুয়ার আর ধানের বাতাস/আমের বোলের বাতাস/মনের মধ্যে এঁকে রেখেছি অঙ্কুর আর কিছু নয়/তুমি প্রসন্ন হও।" (আর এক আরম্ভের জন্য)

"উৎসের দিকে" কবিতাগ্রন্থটি অরুণ মিত্রের কবিতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় বিবর্তনকে সূচীত করে। এই গ্রন্থ থেকেই কবিমানসের যাত্রা সৃষ্টিকর্মের গভীরে, চেতনার প্রত্যন্ত দেশে, অন্ধকার-আলোর ছায়া- ছায়া গভীরে।

পরবর্তী গ্রন্থ "ঘনিষ্ঠতাপ" (প্রকাশকাল ১৯৬৩)-এর কবিতাগুলির বাক্‌প্রতিমা কিংবা প্রতীকী ধ্যান-ধারণায় প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার জগৎ পাঠকের চোখে অন্য অভিধায়, অন্যরূপকল্পে প্রতিভাত হয়েছে॥ "ঘনিষ্ঠতাপ" এর কবিতাগুলি মূলতঃ বিশ্বাসবোধ ও অন্তরঙ্গ মানসিকতার কবিতা। এই কবিতাগুলির মধ্যে যেসব

মানুষ অথবা ঘটনা কিংবা পরিবেশ বর্ণনা করা হয়েছে, তারা প্রত্যেকেই কবির আন্তরিক অভিনিবেশে পরিচিত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট থেকে অনেক দূরে স্থাপিত, অথচ প্রতিমুহূর্তেই পাঠকের মনে হবে তারা কত পরিচিত কিংবা ঘনিষ্ঠ। ঘরের মধ্যে বসে কবি অনুভব করেন আশপাশের গাছের পাতাগুলো একসময় অসংখ্য প্রদীপ হয়ে যায়—কিন্তু চেয়ারটেবিলের ওপর অন্ধকারের ঝোপ নড়ে না, একমাত্র এই আশা নিয়ে কবি টিঁকে থাকেন যে, "কাঠের চেয়ারটেবিল দুটো একদিন শিকড় গজিয়ে মাটি থেকে রস টানতে শুরু করবে এবং সেইসঙ্গে আমি ওইসব আলো-হাওয়ার শরিক হয়ে যাব" (ঘরের মধ্যে)। গাঁ থেকে অনেকখানি পথ ভাঙার পর মেলার মুক্ত পরিবেশ এবং বড় রাস্তার উপর যেখানে ইঁট আর পাথর গুলো প্রচণ্ড ক্ষমতায় ফাটো ফাটো, সেইখানে গলির শরীর এবং তার পটপরিবর্তন কবির দৃষ্টিতে অদ্ভুত সাযুজ্য লাভ করে যখন ছোট ছেলের বাপ-মার শরীরে রক্তের হুল্লোড় লেগে যায় মেলার জমিতে পা দেওয়ামাত্র, (মেলা)—আর গলির মানুষেরা হঠাৎ একটা দারুণ ওলোট পালোটের দিনে "সকলে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, যেন দিগন্তকে এক্ষুনি ভেঙে ফেলে নতুন করে বানাবে।" (একটি গলি)

আলো ছায়ায় যৌথ খেলায় অরুণ মিত্র বাক্-প্রতিমা রচনা করতে আসলে ভালোবাসেন। তাই তিনি যাত্রী হতে চান 'হৃদয়ের কাছে আচ্ছন্ন হৃদয়ে,' উঁচু উঁচু গ্রামে টানা তারে'র স্বরসন্ধানে, 'শেষ পাখির ডাকে'—তাই বলেন, "আমি এই বলি সন্ধ্যা হ'ল/এই বলি চোখ মেলো ভোর/আমি এই দুপুরে থামি এই মাঝরাতে/ছায়ায় আর আলোয় আমাদের চিহ্নিত করি···একটি বাসার খড়কুটো হাওয়ার ফুঁয়ে উড়ে যাবার আগে/সোনার মত জ্বলজ্বল করে/দীর্ঘ উজ্জ্বলতার পথ ধরে/আমাদের দেখা এক একটি নক্ষত্র বিলুপ্ত হয়। (ছায়ায় আলোয় চিহ্নিত)

কিন্তু কবি-হৃদয় জীবন-যন্ত্রণায় আর্ত হয়ে আরো প্রখর দৃশ্যে নিজেকে স্থাপিত করতে চান। অথই অতলে ডুবে যাওয়ার শিল্পীসুলভ প্রশান্তি এবং জীবনের অমোঘ রুক্ষ দাবীর দ্বন্দ্বে বলেন, "আমার দৃষ্টির ভিতরে/যে পৃথিবী বেঁচে থাকে/সেইতো আমায়/জীবনের রক্তাক্ত চূড়ায় রাখে/তাকে মুছে দিলে/আমার কঙ্কাল এক/প্রাগৈতিহাসিক পাথর..." (প্রখর দৃশ্যের মধ্যে)

১৯৭০-এ প্রকাশিত "মঞ্চের বাইরে মাটিতে" অরুণ মিত্রের চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। ষাট-উত্তীর্ণ কবির বাগ্‌ভঙ্গিমায় ও বাক্‌প্রতিমার সতেজ জীবনীশক্তিতে যে আশ্চর্য অভিনবত্ব ও আশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে, তা যে কোন তরুণ কবির কাছে শুধু ঈর্ষাযোগ্য নয়, গভীরভাবে অনুশীলন যোগ্য। এই গ্রন্থে প্রবীণ কবি

তাঁর কবিত্বশক্তির শিখরে আরোহণ করেছেন পরম নিষ্ঠায়, বিশ্বাসে এবং জীবনের প্রতি মমতায়। এই গ্রন্থের কবিতাগুলির শ্বাস এমন আশ্চর্য আনন্দ ও প্রেরণা পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করে যে বারংবার পাঠের পর তার সম্মোহ এবং জাদু ফুরিয়ে যায় না।

কি অসাধারণ বোধির অনুজ্ঞায় কবি বলেন, "প্রাজ্ঞের মত নয়, অন্ধের ছুঁয়ে দেখার মত করে বলো। আমার স্নায়ুতন্তু ধমনী নিয়ে আমি এক অভিন্ন সমতলে আছি···মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টি হীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে আছি।" (প্রাজ্ঞের মত নয়)

কিন্তু মানুষের তৈরী জগৎ-সংসার কেবলি তার চারপাশে একটা ঘেরাটোপ টাঙিয়ে রাখছে কৃত্রিম মঞ্চসজ্জার মত। "শীতের সকালে" শীর্ষক কবিতায় আমাদের জীবনের সেই অনতিক্রম্য ও অমোঘ অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। উঁচু একটা পাঁচিল যেমন জেলখানার হয়। দেখলেই বোঝা যেত বেশ প্রাচীন।" ছেলেবেলায় শীতের সকালে যখন রোদ আটকাত তখন কবি সরে যেতেন দূরে, যেখানে তেরছা একটু রোদ এসে পড়ত। তখন তিনি ভাবতেন এ পাঁচিল কেন তোলা হয়েছে, কেন কেউ এটা ভেঙে দেয় না। তাই রোদের জন্য পেছোতে পেছোতে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা পৌঁছে যেতেন এক সীমান্তে, তারপর খাদ। "আমি ভাবতাম এপাশে পাঁচিল আর ওপাশে খাদ; তাহ'লে আমরা কোথায় আছি।" জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় কবি উপলব্ধি করেছেন যে মানুষ এই ঘেরাটোপ, এই বদ্ধতা, নিয়ম-শৃঙ্খলার অমোঘ শৃঙ্খলে প্রতিমুহূর্তেই তার চেতনার, তার সম্ভাবনার, তার বিকাশের পথে বাধা ও বন্ধনের পাঁচিল থেকে দূরে যাচ্ছে, কিন্তু তাকে চুরমার করে নতুন পথ তৈরী করতে পারছে না, বরং এই বাধা সম্পর্কে তার মোহ ও সংস্কার বেড়ে উঠছে—কবির ভাষায়, "পাঁচিলটা সম্বন্ধে ছেলেমানুষী আমার নেই। আমি এখন তাকে সম্ভ্রান্ত বলে ভাববার চেষ্টা করি। কারণ আমার ভাববার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে এবং আমি নিশ্চিন্ত হবার উপায় জেনেছি।" "শীতের সকালে" কবিতাটি প্রতীকী কবিতার একটি সুন্দর উদাহরণ/কিন্তু যে কথা আগে বলেছি সে কথায় ফিরে আসি। অরুণ মিত্র, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত কবিচেতনায় ভিন্ন ও ব্যাপক অর্থে পরিশ্রমী, অত্যাচারিত এবং 'সাহসী জনগণের কবি। তিনি জগৎ ও জীবনের বিশাল প্রেক্ষাপটের চেহারা কবির অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখেছেন, তাই সমকালীন অস্থিরতা এবং উৎকেন্দ্রিকতার গভীরে সরল সত্যের মুখশ্রীকে দেখেছেন—"মানুষ ও শস্যের

লক্ষণে,/আমার ভিত আমি শক্ত করেই গড়ে ফেলেছি। / যখন মাটিতে তুফান দেখা দেয়/এবং যে যেখানে আছে মুখ থুবড়ে পড়ে/যখন খামার আর, গোলা তুলোধোনা হয়/এবং কারো মাথার গোঁজার একটা কোণও আর থাকে না,/ আমার তা স্বাভাবিক লাগে,/আমার দৃষ্টিতে এমন স্থিরতা এসেছে/আমি মনে মনে/ ওঠা পড়ার ভারসাম্যে পৌছেছি। (ভারসাম্যে)

কবিতায় গভীরতাসন্ধানী অরুণ মিত্র যে ভারসাম্যে পৌছবেন, সেটা প্রত্যাশিত। কিন্তু এই ভারসাম্য জীবনের জীর্ণতায় অমোঘ আঘাতের পরিণতিতে মানুষের ভারসাম্য নয়,-- এই ভারসাম্য শিল্পীর অটল স্থৈর্য, যা অসংহত, বিক্ষত ও আত্মদ্বন্দ্বে বিদীর্ণ সংসার ও সমাজের অন্তর্নিহিত রূপ ফুটিয়ে তোলে ক্যানভাসে; পাথরে, সঙ্গীতে। আসলে সব মহৎ কবিই সেই অনির্বচনীয় অনুভবের জগতে পাঠককে নিয়ে যেতে চান, যার চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভাসলে তিনি বলতে পারেন, "রোজ আমি টলটলে চোখ দুটোর মধ্যে তাকাই। সেখানে যে-ভাষা আছে তা ঠোঁট এসে পৌছবে কি? সে-ভাষা কি ফুল হবে, ফসল হবে? দোসরের ধমনীর রক্ত হবে? আমার ভয় শব্দগুলি যদি শেষ পর্যন্ত আগুন থেকে আলাদা হ'তে না পারে। আমি প্রতীক্ষায় টানটান হয়ে আছি।"

তাঁর পরবর্তী কবিতাগ্রন্থ "শুধু রাতের শব্দ নয়" (প্রকাশকাল: বৈশাখ ১৩৮৫) এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে কবি আরো সংহত ও বলয়িত বাগভঙ্গিমায় তাঁর কবিতার সিদ্ধিতে এসে পৌচেছেন। এ গ্রন্থেও কবিতা, গদ্যের ভঙ্গিতে লেখা, কিন্তু শব্দের ব্যবহার পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থগুলির কবিতার তুলনায় আড়ম্বর-হীন, ঋজু এবং প্রত্যক্ষ। উদাহরণস্বরূপ: "যারা আমার এত কাছে। তাদের আমি নাগাল পাইনা। আমার চোখের জ্বালা কোথায় রাখি। কারো মুখে কোনো আর্দ্রতা নেই·· কোনো হৃদয়ে বুঝি জলধারার দুঃখ নেই। অথচ জলের জন্যই আমার আসা।"

অত্যন্ত স্পষ্টতার প্রকাশেও কিভাবে অস্পষ্টতার ইশারা-আভাস-ইঙ্গিত মেলে ধরা যায়—তার সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছে 'গর্জনের সামনে' কবিতাটিতে— "…সবটাইতো আমাদের ভালোলাগা তোমার সঙ্গে বলতে আমার ভালো লাগে। তোমার সঙ্গে দেখতে আমার লাগে, তোমার সঙ্গে ভাবতে আমার ভালো লাগে।

আমরা কথা বলছিলাম। কথাগুলো যেন জুড়ে জুড়ে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমাদের সমস্ত বোঝাবুঝি পারাপার করছিল।…ঘরে বাইরে

যাচ্ছেতাই চিৎকার আমরা শুনেছি, সব আমাদের কাণে লেগেছিল। তবু আমরা তাদের ছাপিয়ে উঠছিলাম ..।"

বলাবাহুল্য এই "ছাপিয়ে ওঠা" তথা উত্তরণই, যে কোনো সার্থক কবিতার প্রাণশক্তি। অরুণ মিত্র যখন শব্দকে পর পর সাজিয়ে তোলেন, তখন কবিতার যে স্থাপত্য চোখে পড়ে, তা আভরণহীন,—কখনো কখনো তা আবরণহীন। কিন্তু তার সামগ্রিক রূপে যে অসাধারণ ব্যঞ্জনা—তা মেঘের শরীর ভেদ করে বিদ্যুতের মত, আমাদের উদাসীন চেতনাকে চিরে, বাইরে ছড়িয়ে যায়—যেমন, "তুমি উপরে হাত মেললে আকাশে ছায়াপথ/আমাদের পুরনো গুঞ্জন অস্ফুট চওড়া নদীর মত।"—কিংবা, "শব্দগুলো একের পর এক নিবে গিয়েছে/তবু আমার দুচোখের পড়ন্ত রোদ/তোমার মাথার উপর ভোরের আকাশ ধরবে"।

অরুণ মিত্রের কবিতা ওই ভোরের আকাশের মত চিরনতুন রহস্যের আলো-ছায়ার দ্বৈত দৃশ্যপট।

একটি অলোকসামান্য কবি-ব্যক্তিত্ব

কবিকে তাঁর জীবনচরিতে খুঁজতে নিষেধ করে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই নিষেধের কারণ উনিশ শতকের যে মানসিকতা থেকে জাত, আজ তা বলা বাহুল্য বহুলাংশে পরিত্যক্ত। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ নিজেও জানতেন না যে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত রবীন্দ্র-জীবনীর নতুন উপকরণ কবি-মানসিকতা সম্পর্কে স্থির নিশ্চয়ে স্থিত হতে, গবেষক ও সাহিত্য-রসিকদের কতটা সহায়তা করেছে।

আসলে কবি সম্পর্কে যে কৌতূহল ও অবহিতি থাকার অভাব উনিশ শতকে ছিল বিংশ শতকে তা সম্পূর্ণ বিপরীত মাত্রার অবস্থায় পৌঁছেছে। শিল্প সংস্কৃতির অন্যতর ক্ষেত্রে শিল্পীর জীবন সম্পর্কে যে অশোভন কৌতূহল লক্ষ্যণীয়, সাহিত্য-শিল্পীর ক্ষেত্রে সে কৌতূহল অত্যন্ত সীমিত, এবং কবিদের ক্ষেত্রে তা নিতান্ত নগণ্য। এই অবস্থার একটা কারণ এই যে, সমাজে কবিদের কোন শোভন মর্যাদা নেই, অথবা কবিরা স্বয়ং এই সমাজ ব্যবস্থায় ভি-আই-পি হয়ে উঠতে পারেননি। অবশ্য কোন কোন কবি যে তথাকথিত ভি-আই-পি দের প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমাজে মাননীয় রূপে সংবাদপত্রে ঘোষিত ও বন্দিত হয়েছেন, সে কথা সত্য; কিন্তু অপ্রিয় ভাষণের দায়ভাগ নিয়ে বলা যায় যে এই মর্যাদা বা সম্মান, কবিতা-শিল্পের কারণে সামান্যই, তার মূল কারণ অন্যত্র।

এ যুগের একজন প্রতিভাবান কবি সম্পর্কে লিখতে অনুরুদ্ধ হয়ে, বারংবার আমার এসব কথাই মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল-বিশেষ করে কবি সম্পর্কে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ যখন বিষয়বস্তু, তখন এ প্রসঙ্গে বিতর্কসাপেক্ষ মনোভাব গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা প্রবল। সে কারণে কবি ও মানবিক ব্যক্তিত্বের তুলনামূলক আলোচনায় যেতে আমি আগ্রহী।

ভূমিকার প্রচলিত পর্দা উন্মোচন করে বলি, আমার আলোচ্য কবি হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সম্পর্কে কোন কথা বলা যত সহজ আমার বিবেচনায় সম্ভবতঃ ততটাই কঠিন। সহজ কথা বলা যেমন সহজ নয়, সহজ ও স্বচ্ছন্দ মানুষদের সম্পর্কে কোন নিশ্চিত ধারণা করাও তেমন সহজ নয়, বরং রীতিমত কঠিন।

তবে প্রথমেই বলে রাখি, আমার অত্যন্ত সীমিত অভিজ্ঞতায় যত মানুষ দেখেছি, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন মনে রাখার মত মানুষ। তাঁর সঙ্গে পরিচিত এবং আমার চেয়ে বড় বা আমার সমবয়সী অনেক কবি বা কথাশিল্পীরা অনেক অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবেন, এবং সে বর্ণনা হয়ে উঠবে বহু কোণ-বিচ্ছুরিত হীরকদ্যুতির মত, কারণ আমাদের সকলের কাছেই তিনি বীরেনদা হয়ে উঠেছেন জ্যেষ্ঠের স্বাভাবিক মর্যাদায় এবং ভালোবাসায়। আমার কাছে কিন্তু বরাবরই বীরেনদা নতুন জাতের মানুষ, নতুন ব্যক্তিত্বের মানুষ, যাঁর ঘরের দরজা যেমন সকলের জন্য অবারিত, হৃদয়ের দরজাও তেমনি সকলের জন্য উন্মোচিত। আসলে বীরেনদা মানুষ হিসাবে এমনই স্বাধীন ও মুক্ত স্বভাবের যে, তিনি ঘরের ও হৃদয়ের দরজা বন্ধ করতে জানেন না। এক হিসেবে তাঁর এই মানসিকতা জীবনের অন্যতম ঐশ্বর্য, এবং অন্য হিসেবে তাঁর জীবনে ট্রাজেডীর বীজ।

কেন জানি না, গত প্রায় পনের বছর ধরে বীরেনদাকে নানাভাবে, নানা-ভূমিকায় দেখে, তাঁকে এক অদ্ভুত Tragic Figure বলে মনে হয়েছে। অত্যন্ত নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাঁকে আমি বিচার করার চেষ্টা করেছি। তাঁর উল্কা-প্রতিম ব্যক্তিত্ব, অত্যন্ত নির্ভীক ও সতেজ বাচনভঙ্গী এবং সর্বোপরি কি ব্যক্তিগত আচরণে, কি কবিতার অমোঘ শব্দ চয়নে, মনুষ্যত্বের ধ্রুব আদর্শের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, সম্ভবতঃ কোন মহৎ ট্রাজেডীর নায়কের পক্ষেই সম্ভব।

এই শেষোক্ত প্রসঙ্গ, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং তাঁর কবিতাকেও প্রভাবিত করেছে। আমার স্থির ধারণা যে এই আদর্শে তাঁর নিষ্ঠা, সাধনা ও তপস্যার সমগোত্রীয়, এবং সেই কারণেই পঞ্চাশেধেও তাঁর উদ্যম ও জীবনীশক্তি যে কোন তরুণের কাছে শুধু উদাহরণ যোগ্য নয়, ঈর্ষাযোগ্যও বটে। তাছাড়া আরো একটি কারণে তাঁর সমগ্র আচরণ আমার কাছে ঈর্ষণীয় মনে হয়, তাহ'ল, মানুষের শুভবোধে তাঁর অটল আস্থা। তিনি Foolish optimist ন'ন, তাঁর সমগ্র চরিত্রে সংগ্রামী মনোভাব অত্যন্ত কঠোর কিন্তু মানুষের পবিত্র ও অমল এক চরিত্র রূপায়ণের জন্য তিনি বোধ হয়, সারা জীবনকে বাজী ধরতে পারেন। তাঁর এই অটুট বিশ্বাসবোধ, চারিদিকের অমানবীয় আয়োজনের মধ্যে এমন সংশয়হীন যে আমার মনে হয়, তাঁর বোধ ও বোধির পরিমাণ লৌকিক কোন উপায়ে পরিমেয় নয়/'অলৌকিক' বা 'ঐশ্বরিক' কথাটির প্রতি অনেকের মনে অন্যবিধ প্রতিক্রিয়া হ'তে পারে, কিন্তু এ ছাড়া তাঁর এই আস্থার যথার্থ পরিচয় দিতে পারছি না। এই বিশ্বাসবোধের প্রমাণ তিনি রেখেছেন 'পাথর' নামে

কবিতায়ঃ "ও মাটির সমস্ত পাথর ; / তবু তোর হৃদয়ের জ্বর / ধুয়ে দিতে দেখরে উন্মাদ, / নদী হয় ওরই তো অন্তর / ও মাটির সমস্ত পাথর / তবু তোর দিগন্ত নীলিমা / ভরে দিতে, দেখরে উন্মাদ / আলো হয় ওর-ই তো প্রতিমা / ও মাটির সমস্ত পাথর ; / মূর্খ ওকে নমস্কার কর।"

* * *

কোন কবির কবিতা পাঠ করার পর, তাঁর মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পাঠকের মনে যে ধারণা গড়ে ওঠে. কবিকে ব্যক্তিগতভাবে জানলে, সে ধারণা প্রায় সময়েই হয়তো ভুল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সব কবির ক্ষেত্রে এই মনোভাব গ্রাহ্য নয় ; যাঁরা, তাঁদের শব্দচয়নে অত্যন্ত প্রখর ভাবে সচেতন এবং যাঁদের কবিতায় জীবনের ধ্রুব আদর্শের একটা স্পষ্ট অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি অমোঘ দৈববাণীর মত ঘোষিত, মানুষ হিসেবে সেই কবিরা অন্য জাতের ; তাঁদের বিশিষ্টতা হাজার কবির সম্মেলনেও উপলব্ধি করা যায়। আমার ধারণায় বীরেনদা সেই বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তিত্ব।

সমস্ত শিল্পকর্মের মধ্যে কবিতাই একমাত্র শিল্প যেখানে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একাত্মমিলন অত্যন্ত জরুরী। তাঁর কবিতার ভাষা এবং তাঁর বিশ্বাসের ভাষা এক হওয়া চাই। এখানে কোন ফাঁক বা ফাঁকির অবকাশ নেই। আমরা যারা কবিতা লেখবার প্রাণপণ চেষ্টা করেও কবি হতে পারিনি—কবিতা লেখকের Mediocre অস্তিত্ব নিয়ে চেনা শব্দের গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াই, সেই আমরা জানি যথার্থ কবি হয়ে ওঠা কত দুরূহ, কত কঠিন, কত যন্ত্রণাদায়ক। আবেগ-তাড়িত অনুভব, ক্ষোভ-দুঃখ-ঘৃণা ভালোবাসার প্রতীক হয়ে ওঠে যেসব শব্দ, তাদের সাজিয়ে রাখার মধ্যেই কেবল কবির বাহাদুরী আছে, শক্তির প্রমাণ নেই। এই শক্তির প্রমাণ ফুটে ওঠে যখন পাঠক উপলব্ধি করেন কথাগুলো যেন কখনো গান হয়ে উঠছে। কখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, আবার কখনো ভালোবাসায় বা স্নেহে চুম্বনের শব্দে বেজে উঠছে। বীরেনদার কবিতার মধ্যে আমরা বারেবারেই এই জীবন্ত রক্তাক্ত-ক্ষত-বিক্ষত শব্দের ধ্বনি শুনতে পাই, এবং স্বীকার করতে বাধা কি—ওই দৈববানীর মত ঘোষিত শব্দাবলীর আড়ালে এক যন্ত্রণার্ত-প্রেমার্ত-ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ আত্মার স্পষ্ট অবয়ব দেখতে পাই।

অনেকদিন আগে টলষ্টয় সম্পর্কে একটা প্রবন্ধে পড়েছিলাম টলষ্টয় এক তরুণ লেখককে লিখেছিলেন—"Write only when you leave a piece of flesh in the ink-well every-time you dip your pen"—ফাউন্টেন

পেন, ডটপেনের যুগে এই উপদেশের অসাধারণ তাৎপর্য বোঝানো কঠিন। নিবের ডগায় যতটুকু কালি ধরে, সেইটুকু লিখে, আবার কালির দোয়াতে কলম ডুবিয়ে বারবার লেখা—এযুগে হাস্যকর বলে মনে হ'লেও জগতের সেরা উপন্যাস-গল্প-কবিতা লেখা হয়েছে এইভাবেই। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে নিজের Flesh বা মাংস তথা অস্তিত্বকে কালির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে, তারপর লিখে যাওয়ার মধ্যে যে ইঙ্গিত রয়েছে,—তাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন বীরেনদা। ঠিক এই কারণেই মানুষ হিসেবে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করলে তাঁর কবিতার প্রসঙ্গ অবধারিতভাবে আসবেই ; বিপরীতক্রমে তার কবিতা সম্পর্কে আলোচনায়, মানুষ হিসেবে তাঁর ঋজু ও সবল ব্যক্তিত্বের কথা উঠবেই। যে কথা আগে বলেছি, সে কথায় ফিরে আসি—কবিতা-শিল্প ও রক্ত মাংসের কবির মধ্যে ভেদ রেখা টানার বাহাদুরি একান্তভাবে বিংশশতকীয়। যাঁরা এই ভেদরেখায় বিশ্বাসী হয়ে দ্বৈত-অস্তিত্বে সমানভাবে সফল হয়েছেন বলে দাবী করেন, অথবা তাঁদের ভক্তবৃন্দের নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে নেপথ্য থেকে ঘোষণা করাতে চান ;—আমাদের পরম সৌভাগ্য বীরেনদা তাঁদের সমগোত্রীয় ন'ন। বাংলা কবিকুলের মধ্যে এখানেই তিনি নিঃসঙ্গ ও একক। সেইজন্য তিনি অসংশয়ে বলতে পারেন, "বত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে / যদি আমি সমস্ত জীবন ধরে / একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম / একটি গাছ জন্মাতে পারতাম / যেই ফুল ফল ছায়া দেয় / যার ফলে পাখীদের ক্ষুধা মেটে, / —ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে / যদি আমি মাটিকে জানতাম।" এই কবিতা পড়লে কি মনে হয়না কবিতা ও মানবিক প্রত্যয় একাত্ম ও অভেদ্য হয়ে উঠেছে? সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের কৃতিত্ব, সাধনা এবং ক্ষমতার প্রতি কোনরকম কটাক্ষ না করে একথা বললে আমার মন্তব্য স্পর্ধার মত শোনাবে না যে, এযুগে নিরাভরণ ও নিরাবরণ উচ্চারণে একমাত্র বীরেনদাই বলতে পারেন,—"আমি কোনদিন / শুনিনি বেশ্যার কান্না, দেখিনি দুয়ার দিয়ে / দাগী চোর, খুনী আর জারজ সন্তানদের বিবর্ণমুখের আলো / আমি কোনদিন তাদের পাপকে চুমা খেয়ে তাদের পায়ের নীচে মাথা রেখে। হইনি অমল। আমি কিছুই শিখিনি এ জীবনে শুধু ঈর্ষা, ঘৃণা আর। কবির কলহ ছাড়া।"

* * *

অসাধারণ সাহস এই কবি-চরিত্রের অন্যতম গুণ যা তাঁর ব্যবহারে এবং কবিতার মধ্যেও, আমি বহুদিন লক্ষ্য করেছি, বরং বলা উচিত, স্পর্শ করেছি। এই সন্ত্রস্ত ও সুযোগ-সন্ধানী কবিকুলের অন্য কারো কথা জানি না,—আমার কাছে

তিনি মানবীয় স্পর্ধার অতন্দ্র প্রতীক। যাঁরা কবিতার পটভূমিকায় ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি মনের মধ্যে মাঝে মাঝে দোলাতে চান, তাঁদের কাছে অবশ্যই তিনি হঠকারী, শোভনতা লঙ্ঘনকারী; কিন্তু এই স্বচ্ছন্দ মানসিকতার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় কাছের মানুষ। কেননা, যে কথা আমরা প্রতিমুহূর্তে প্রকাশ করবো বলে মনে করি, কিন্তু কি এক অক্ষমতায় বা ভীরুতায় বলতে পারি না,—অবলীলাক্রমে তিনি তা বলে ওঠেন দুর্জয় ক্রোধে, অকুতোভয় বীর্যে, ব্যঙ্গে ও বিদ্রূপের শাণিত শব্দাবলীতে :

"আজো খুনী হেঁটে যায় প্রত্যেকের চোখের সামনে। মায়ের চোখের জলে ·· কেউ নেই তাকে প্রশ্ন করে, কেউ নেই প্রকাশ্য রাস্তায় তার কাঁধে। হাত রেখে বলে, 'তোমার বিচার হবে' ......

এদেশে অনেক মুখর বিপ্লবী কবি আমরা দেখেছি যাঁরা দলবিশেষের গতি-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে কবিতা লিখেছেন,—দেখেছি, বিরাট প্লাটফর্মে স্থান নির্দিষ্ট করার জন্য অকবিজনোচিত চাতুর্যে ও কুশলতায়, সাফল্যের মই বেয়ে (না কি এলিভেটারে কিংবা এসক্যালেটারে চড়ে ?) তাঁরা অনেক উঁচুতে চলে গেছেন। হয়তো সে জন্যই তাঁরা সাহসের সঙ্গে, 'চোখের সামনের নির্জলা সত্য ঘটনাকে বর্ণনা করার মানবিক দায়িত্বটুকু পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছেন। এই জন্যই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কণ্ঠ মিলয়ে তাঁরা বলতে পারেন না—"আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে। ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ ; । উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে। নিশাচর শ্বাপদেরা......কতটুকু আসে যায় তাতে। আমার, যে আমি করি প্রত্যহ প্রার্থনা, "তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে", কিংবা যখন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়," ভিক্ষার মিছিল যায় / নর খাদক বাঘের সিংহ দরোজায় / পাঠায় স্মারকপত্র চায় / নিরাপত্তা একটা দুটি স্বপ্ন দেখা জীবনের বিনিময়ে। ক্রীতদাস পশুদের উলঙ্গ অভুক্ত বেঁচে থাকার অস্তিত্ব। জীবন এখনো আশ্চর্য রূপকথা, এই বিংশ শতাব্দীতে, দেখি তাই..." তখন আমার বারেবারেই মনে হয়, মনোরম-মিষ্টি প্রেমের উপন্যাসে ডুবে যাওয়া বয়স্ক-শিশুদের এই অসাধারণ রূপকথা শোনাই,—যে রূপকথার কাহিনী তাদের স্নায়ু-শিরা-গ্রন্থির মধ্যে অভাবিত রোমাঞ্চের স্বাদ এনে দেবে।

মধ্যবিত্ত মানসিকতার মূর্তিমান প্রতিবাদরূপে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের চোখের সামনে প্রায় 'Legend' হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর অনেক পরে এসে, তাঁর

খাপ-খোলা তরবারির মত তারুণ্যের দিকে তাকিয়ে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি, নিজেদের কাপুরুষতায় দগ্ধ হয়েছি,—বাংলা কবিতার পালাবদলের জোয়ারে খড়-কুটোর মত ভেসে থাকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তাঁর প্রতি নিবেদিত আমাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা প্রণাম পরবর্তী কালের জন্য অর্থবহ হয়ে থাকবে। আমাদের মর্মান্তিক ব্যর্থতা ও গ্লানির মধ্যেও একটি পরিপূর্ণ সান্ত্বনা জেগে থাকবে আমাদের ছোট মাপের ছোট জীবনে যে—আমরা এমন এক ঋজু চরিত্রের কবি এবং মনুষ্যত্বের অমল আদর্শে আত্মনিবেদিত মানুষের সান্নিধ্যে এসেছি।

খ্যাতি ও পুরস্কারের সঙ্কীর্ণ ও গোপন রাস্তা পরিত্যাগ করে তিনি অত্যাচারিত ও অবমানিত মানুষের মিছিলে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই লোভার্ত ও চাতুর্যে কুটিল কবিকুলের মধ্যে আপন প্রত্যয়ে স্থিত থেকে এযুগে একমাত্র তিনিই জার্মান কবি হাইনের ভাষায় বলতে পারেন,—"**I have never laid great store by poetic glory, and whether my songs are praised and blamed matters little to me. But lay a sword on my bier for I have been a good soldier in the wars of human liberation.**"

[যে পৃথিবীকে এক করার স্বপ্নে কবিতার অজস্র ফোয়ারা তিনি ঝরিয়েছিলেন,—সেই পৃথিবীর সব মমতা এবং তাঁর সাধ ও সাধনার অন্বিষ্ট কবিতার অফুরাণ মায়া কাটিয়ে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ১১ই জুলাই ১৯৮৫ চিরকালের জন্য বিদায় নিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা কবিতার একটা বিশেষ যুগের অবসান ঘটেছে—যে যুগের প্রতীকী অগ্নিশিখা, তিনি অগ্নিহোত্রীর মত একাকী আমরণ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে, এই কারণে তিনি একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়—সে অধ্যায় একক—অনন্য এবং অবিসংবাদীভাবে অলোকসম্ভব।]

হেমন্তের গান

১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে টমাস ওয়েন্টওয়ার্থ হিগিন্‌সন নামে সেদিনকার আমেরিকার এক প্রখ্যাত যাজক, প্রাবন্ধিক, পত্রিকা-সম্পাদক, একটি চিঠি পান। এই চিঠির সঙ্গে চারটি কবিতা ছিল: এই চিঠির প্রেরক জানতে চেয়েছেন যে কবিতাগুলি জীবনের উত্তাপে উষ্ণ কিনা, এবং প্রকাশযোগ্য কিনা। এই কবি-যশোপ্রার্থী হলেন তিরিশ উত্তীর্ণ এক মহিলা—নাম, এমিলি ডিকিন্‌সন। এর কিছুদিন আগে Atlantic Monthly নামে একটি পত্রিকায় হিগিন্‌সন Letter to a young Contributor শীর্ষক রচনায় উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ লেখকদের প্রতি কিছু উপদেশ দান করেছিলেন। উপরোক্ত চিঠিটি তারই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

তারপর হিগিন্‌সন্ এই কবির কাছ থেকে আরো কবিতা পেয়েছেন, কিন্তু সে সব রচনায় তিনি কবিত্বের প্রমাণ পান নি; তাঁর মনে হয়েছে কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য কিন্তু অদ্ভুত,—বড় বেশী সূক্ষ্মতায় ভারাক্রান্ত এবং প্রকাশ করার উপযুক্ত নয়। এমিলি ডিকিন্‌সনের জীবিতাবস্থায় তাঁর কোন কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে ১৮৯০ সাল তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৯১ সালে সমালোচক হিগিন্‌সন্ তাঁর স্মৃতিচারণে স্বীকার করেন যে তাঁর মনে ডিকিনসনের প্রেরিত কবিতাগুলি গভীর রেখাপাত করেছিল, এবং প্রায় তিরিশ বছর আগে তিনি যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন,—এবং যাঁর সমাধান তিনি কখনও পাননি, তা হল সাহিত্যে কোথায় এই অসাধারণ কবিতাগুলির স্থান হবে, যাদের কোনোটিকেই সমালোচনার ঘেরাটোপে চিহ্নিত করা যায় না।

আসলে পুরনো ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, উনিশ শতকের একজন রক্ষণশীল সাহিত্যিক, বিচার করতে চেয়েছিলেন এমন এক কবিপ্রতিভাকে, যাঁর শিল্পকুশলতা, শব্দব্যবহার, বাকপ্রতিমা সম্পূর্ণ নতুন জাতের, এবং নতুন যুগের। সেই নতুন যুগের অভিনন্দন শোনার জন্য অবজ্ঞাত, নিঃসঙ্গ কিন্তু নিরভিমানী, ডিকিনসন জীবিত ছিলেন না। আমেরিকার কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এটা একটা বিরাট

অভিনীত হয়েছে সমসাময়িক কালের উদ্ধত বিচারবোধ আপন রুচি সম্পর্কে নিঃশংসয় নিষ্ঠুরতায় বরাবরই উল্লাস প্রকাশ করেছে প্রতিভার অবমাননায়, এবং বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে বিগত দুই দশকের ইতিহাসে তার মর্মান্তিক প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে এখানে—ওখানে—সর্বত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেটস এর অন্তর্গত আমহার্ষ্ট শহরে এমিলি ডিকিন্‌সন জন্মগ্রহণ করেন: সময় ১৮৩০ সালের ১০ই ডিসেম্বর। যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, সেই গৃহে তিনি মারা যান ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরে। মাঝে কয়েকবার তিনি শহরের বাইরে অন্যত্র গিয়েছেন. ভ্রমণ করেছেন ফিলাডেল্‌ফিয়ায়, বোষ্টনে, এবং ওয়াশিংটনে, কখনো যাত্রা করেছেন পার্শ্ববর্তী শহরে। এছাড়া তিনি আমহার্ষ্ট শহর ত্যাগ করেননি এবং তাঁর জন্মস্থান, তাঁর পিতৃগৃহ ছেড়ে অন্য কোথাও বাস করার কল্পনাও করেন নি।

এমিলির পিতা হাওয়ার্ড ডিকিন্‌সন্ আমহার্ষ্টের উদীয়মান আইনজ্ঞ ছিলেন; আমহার্ষ্ট কলেজের কোষাধ্যক্ষ পদে তিনি চল্লিশ বছর ধরে কাজ করেছিলেন, মাসাচুসেট্‌স এর আইনসভায় প্রত্যভাবে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও হাওয়ার্ড ডিকিন্‌সন্ ওয়াশিংটনে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে তাঁর কর্মচাঞ্চল্যকে প্রসারিত করেছেন।

এমন এক প্রগতিসম্পন্ন পরিবারে এমিলি ডিকিন্‌সনের ছেলেবেলা কেটেছে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও উন্নতি সম্পর্কে হাওয়ার্ড ডিকিন্‌সন অত্যন্ত মনোযোগী ছিলেন। অন্যান্য সঙ্গতিসম্পন্ন মেয়েদের মতই এমিলির ছেলেবেলা কেটেছে। আমহার্ষ্ট একাডেমিতে তাঁর বাল্যশিক্ষা শুরু হয়েছে-সতের বছর বয়সে তিনি মাউন্ট হোলিওক্ সেমিনারীতে যোগদান করেন। আমহার্ষ্টের পরিবেশ অত্যন্ত রক্ষণশীল হলেও বুদ্ধিমতী ও উচ্ছল স্বভাবের তরুণীরূপে এমিলি পিক্‌নিকে যোগ দিয়েছেন, পার্টিতে গেছেন, এমনকি নাচের আসরেও অংশ নিয়েছেন। লোকালয়ের সামাজিক কাজে কর্মেও যুক্ত থেকেছেন এমিলি. পিতার সঙ্গে গিয়েছেন ওয়াশিংটনে।

অথচ ভিতরে ভিতরে এমিলি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন কবিতা নামক শিল্পের বিচিত্র এবং রহস্যময় কর্মে। নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন এক নিঃসঙ্গ অস্তিত্বে। তেইশ বছর বয়সে তিনি ফিলাডেলফিয়াতে গিয়েছিলেন। আমহার্ষ্টে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রায় নিয়তির মত, তাঁর সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে তিনি ছিলেন এক যাজক, কবি, প্রচারক এবং অত্যন্ত বিদ্বান এক বিবাহিত পুরুষ। এমিলির

কবিতায় তাঁদের স্বল্প সাক্ষাৎকারের বিবরণ আছে। উভয়ের মধ্যে গড়ে ওঠা ভালোবাসার গভীরতা ব্যক্তিগত স্তরে সম্ভবতঃ অমুচ্চ ছিল, যদিও এ প্রসঙ্গে নানা গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এ ভালোবাসার মৌল চরিত্র যেহেতু ত্যাগ ও বিচ্ছেদেই মহিমান্বিত হয়েছিল, সে কারণে অতৃপ্তি ও অচরিতার্থতার মধ্যেই এমিলি তার সার্থকতা খুঁজে পেয়োছলেন।

তাঁর জীবননাট্যের মতই এমিলির কবিতা একদিকে যেমন রহস্যময়, তেমনি কাঁচবঙা জলের মত স্থির ও শান্ত। তাই তাঁর জীবনের কর্ম্মপ্রবাহের সঙ্গে কবিতার সংযোগ সর্বত্র খুঁজে বার করা দুরূহ। অনুপম সারল্যে এবং গভীরতায় এমিলি ধর্মবিষয়ক কবিতা লিখেছেন, অথচ তিনি চার্চে যেতেন না। তাঁর প্রেমের কবিতাগুলি তীব্রতায় এবং চিরকালীন আবেদনে মধুর, অথচ তিনি বিবাহ করেন নি,—এবং যেটুকু প্রণয়-কাহিনী তাঁর সম্পর্কে জানা যায়, তাও তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে, এমন কথা বলা যায় না। শুধু তাঁর শেষ জীবন নিঃসঙ্গতায় কেটেছিল বছরের পর বছর, কিন্তু কোন জ্বালা—অনুতাপ—ক্ষোভ আর্তি তাঁকে বিষণ্ণ করেনি। আশ্চর্য সংযম ও উচ্ছ্বাসহীন ভঙ্গিমায় তিনি নিজেকে নিবেদন করেছেন প্রকৃতির উজ্জ্বল পটভূমিকায় এবং ঈশ্বরের পদতলে। শান্ত ও স্থমিত উচ্চারণে তাই তিনি বলেছেন,

"This is my letter to the world,
That never wrote to me,—
The simple news that Nature told,
With tender majesty.

Her message is committed
To hands I cannot see,
For love of her, sweet countrymen,
Judge tenderly of me."

* * *

এমিলি ডিকিন্‌সনের কবিতায় জীবন, তার সামগ্রিকতায় ফুটে উঠেছে; কিন্তু তার জন্যে তিনি বিরাট কোন দার্শনিক তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, কিংবা জটিল বাক্‌প্রতিমায় কবিতার শরীর গঠন করেন নি,—যা সপ্তের শতকের প্রারম্ভে ইংলণ্ডের "মেটাফিজিকাল্‌" কবিতায় ডান অথবা মার্ভেল্‌ কিংবা হার্বার্ট করেছিলেন। অথচ বক্তব্যে এবং ভঙ্গিমায় এমিলি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়েও অনেক

বেশী গভীরতা-সন্ধানী ছিলেন, এবং কল্পনার বিস্তৃত সঞ্চরণের আশ্রয় না নিয়েও অত্যন্ত সাধারণ ও পরিচিত অভিজ্ঞতা থেকে অসাধারণ প্রতিশ্রুতি পাঠকের কাছে মেলে ধরেছেন : জীবনের সব সুখ-দুঃখ-নিঃসঙ্গতা,—বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাকারে ছড়িয়ে দিয়ে তিনি অর্জন করেছিলেন আশ্চর্য এক স্থিতধী-চিত্ত। তাই সহজ ও উচ্চারণে তিনি বলেন,—

"ছিল না আমার ঘৃণা করবার সময়
কারণ, কবর দেবে তো আমাকে বাধা
এবং জীবন এত সুবিশ্যস নয়
বৈরীতা সব, শেষ করে দিতে পারি।"

পরক্ষণে সেই নৈর্ব্যক্তিকতা অক্ষুন্ন রেখেই তিনি বলেন,

"Nor had I time to love , but since
Somo industry must be,
The little toil of love, I thought
Was large enough for me."

ঘৃণা ও ভালোবাসা যে আসলে এক মহা-দ্বৈততার প্রতীক—বিশ্বপ্রকৃতিতে তার বিচিত্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে,—তা এমিলি তাঁর কবিতায় বহু জায়গায় বলেছেন, জীবন এই বিপরীত অবস্থার সমন্বয়েই গড়ে উঠেছে ; তাই বাইরের সংঘাত ও ভিতরের সংঘাত এর দ্বৈততা প্রকাশে তিনি বলেছেন :

"To fight aloud is very brave
But gallanter, I know
Who charge within the bosom
The cavalry of woe."

কিন্তু আমাদের ভিতরের মানুষ যে সর্বদাই বাইরের অস্তিত্বের রূঢ়তায় বিপর্যস্ত এবং বিভ্রান্ত—সেই অবস্থার বর্ণনায় তিনি বলেন,

"আমি কেউ নই ! তুমি কে হে বল ?
তুমিও কি তবে কেউ নও ?
তাহলে তো জোটবদ্ধ আমি আমরা,—কাউকে বোল' না
ওরা সব নির্বাসনে-ঠেলে দেবে, আমাদের, জেনে রাখো তুমি।"

সমাজে-সংসারে কেউ একজন হয়ে ওঠা সাফল্যে, উন্নতিতে কিংবা জীবনের দ্রুত প্রতিযোগিতায়—আমাদের সকলের কাম্য। এমিলি ডিকিন্‌সন এই তীব্র

প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে এসে, নিঃসঙ্গ পরিবেশের মধ্যে থেকে তার চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দর উপমায়—

"How dreamy to be somebody !
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog !

কিন্তু অন্য এক পরিমাপের এককে আমাদের অস্তিত্বের মহত্ব সম্পর্কে এই নিঃসঙ্গ কবি আশ্চর্য বিশ্বাসী ; তাই তিনি বলতে পারেন যে, আমরা জানি না আমাদের উত্তরণ কত মহৎ হতে পারে, আমাদর উত্থানের কালবেলায় তার স্বরূপ বোঝা যায়,

"And then, if we are true to plan
Our statures touch the skies."

এমিলি ডিকিন্সনের কবিতায় বৈশিষ্ট্য তাঁর শব্দব্যবহারে সংযম। তিনি একই সঙ্গে মূক ও মুখর, এই উভয় মানসিকতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর প্রকৃতি বর্ণনায়, প্রণয় উচ্চারণে এবং অনন্ত সময়ের প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি মেলে দেওয়ার কুশলতায়। ভঙ্গিমায় ও রীতিতে তিনি মাঝে মাঝে খেয়ালী স্বভাব প্রকাশ করেছেন, কোন কোন কবিতায় তিনি স্বরপ্রয়াসকে অসাধারণ এক পাহাড়ী উচ্চতায় তুলে ধরে, ধ্বনিব্যঞ্জনাকে সহসা খাদের নীচে ফেলে দিয়েছেন। পাঠকের স্তম্ভিত বিচারবোধ যেন একটা আকস্মিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ তার একটা বড় কারণ, তাঁর কবিতার আদর্শ ; এই আদর্শ এত বেশী মাত্রায় সংহত ও ঘনীভূত যে তার মধ্যে "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" জাতীয় উন্মেষের কোন স্থান নেই। তাই তিনি কবিকর্ম সম্পর্কে বলেন যে কবিরা শরৎঋতু ছাড়াও মাঝে মাঝে গন্ধময় দিনের কথা বলেন, বর্ণনা করেন একদিকে জমে থাকা তুষারের কথা, কিংবা অন্যদিকে প্রসারিত কুয়াশার অস্পষ্ট চিত্র। কিন্তু অন্য কবিরা তীব্র রোদ এবং থমথমে সন্ধ্যার কথা বলুন, অথবা বর্ণনা করুন নদী-জলধারার কথা,—কবি স্বয়ং কি চান ? তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন,—

"Perhaps a squirrel may remain
My sentiments to share
Grant me, O Lord, a sunny mind
The windy will to bear."

প্রেমের কবিতায় এমিলি ডিকিন্‌সন যে গভীরতায় স্পর্শ রেখেছেন, তা ইংরাজী সাহিত্যেঃদুর্লভ : সংক্ষিপ্ত ও পরিমিত উচ্চারণে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন,

"To wait an hour is long
If love be just beyond ;
To wait eternity is short
If love be at the end."

কিংবা আরো রহস্যময় উক্তির মাধ্যমে এমিলি বলেছেন,

Love is anterior to life
Posterior to death
Initial of creation, and
The exponent of breath."

তেমনি, স্মৃতি বিস্মৃতির আলোছায়া মেলে ধরে তিনি বলতে পারেন,

"হৃদয় ! আমরা তাকে ভুলে যাব জেনো
আজ রাত্রে তুমি আর আমি
ভুলে যেতে পারো তুমি, তার সেই স্পর্শের দহন
আমি যাব ভুলে তার আলো !
তোমার সমাপ্তি হ'লে বোল' তুমি, মিনতি জানাই
আমারো ভাবনা যাতে আবছা হ'তে পারে,
হও তুমি দ্রুত, পাছে, বিলম্বিত তোমার কারণে
আমি তাকে মনে রাখি ফের।"

আধ্যাত্মিক কবিতায় এমিলি একই বাগ্‌ভঙ্গিমায় নিজের হৃদয় উন্মোচন করেছেন, যে উন্মোচনে বিশ্বাসবোধ পাহাড়ের চেয়েও দীর্ঘ এবং অটল,—এবং সেই বিশ্বাসে ভর করে তিনি বলতে পারেন

The only news I know
Is bulletins all day
From Immortality."

এবং তাঁর চোখে যা কিছু দৃশ্যমান আজ এবং আগামী কাল, তাহ'ল অনন্ত সময়। আর যে সাক্ষাতের কোন সীমা-পরিসীমা নেই, যার জন্ম-মরণের পারাপার নেই, সে প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"The only One I meet
Is God,—the only street
Existence, this traversed…"

এমিলি ডিকিন্‌সনের মৃত্যুর চার বছর পরে ১৮৯০ সালে তাঁর ভগিনী ল্যাভিনিয়ার ব্যবস্থাপনায়, তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রচার পরিচিতি কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯১৪ সালে "The Single Hound" নামে আরো একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের কলরোলে সে সম্বন্ধে কোন আলোচনার সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই ছিল না। ১৯২৪ সালে তাঁরই এক আত্মীয়ার দ্বারা প্রকাশিত The Life and Letters of Emily Dickinson আমেরিকার সাহিত্য জগতে বিরাট-আলোড়ন সৃষ্টি করে, এবং তার কবিতা সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহের উৎসাহের সঞ্চার হয়। তারই পরিণতিতে ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় Further Poems এবং .৯৩৫ সালে Unpublished Poems অসাধারণ সাড়া জাগিয়ে তোলে। এমিলির কবিখ্যাতি অন্য সমস্ত আমেরিকান কবিদের কৃতিত্ব ম্লান করে দেয়। কয়েকজন সমালোচক তাঁকে উনিশ
শতকের শ্রেষ্ঠ আমেরিকান কবিরূপে স্বীকৃতি দান করেন, এবং আটল্যান্টিকের এপারেও তাঁর খ্যাতির ঢেউ এসে পড়ে। কবি মার্ক ভ্যান ডোরেন বলেন, "Emily Dickinson is much the best of women poets and comes near the crown of all poetry.

যে কবি জীবিতকালে কোন স্বীকৃতি পান নি, তাঁর মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে তার প্রশস্তিতে আমেরিকার সমগ্র সাহিত্য মুখর হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত আমেরিকান কবি লুই আণ্টারমেয়ার বলেছিলেন যে ডিকিন্‌সনের দুঃসাহসিক বাক্‌প্রতিমায় এবং চোখ ধাঁধানো ভাববিনিময়ে পাঠক হিসাবে আমরা কৃতজ্ঞ, এবং এই ভাববিনিময় তথা হৃদয়সংযোগ,—সম্ভবতঃ সাফো ছাড়া, এমিলি ডিকিন্‌সনকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবিরূপে মর্যাদা দান করেছে। এই অসাধারণ খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে এমিলি ডিকিন্‌সনের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করে আলোচনা শেষ করি—

"Fame is a bee
It has a song
It has a sting
Ah, too, it has a wing"

পরিশিষ্ট

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যাযাবর-চরিত্রের চিহ্ন বোধ হয় আছে। তার শুরু প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায়, মানুষ ক্রমাগত তার থাকার এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে; 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে'—এই আর্তি তার স্নায়ু-শিরা-মজ্জা-অস্থি-র অবিরাম ঘোষণা। বাসস্থান পরিত্যাগ করার প্রাথমিক কারণ ছিল ভৌগোলিক, অর্থাৎ বিরুদ্ধ প্রকৃতি, আহার-সংস্থান ইত্যাদি। কিন্তু সভ্যতার চরম অবস্থায় এসে স্থিতিশীল হয়েও, মানুষের প্রকৃতি খুব একটা বদলায়নি। মানুষ চির ভ্রাম্যমান!

তাই পাহাড়ের শিখরে, মরুবালুকায়, বরফশীতল মেরু প্রদেশে যাত্রা করার, উন্মাদনা আজো দেখা যায়। দুর্গম পথ পরিক্রমায় তার ক্লান্তি নেই, অজানা সমুদ্র পাড়ি দেবার দুঃসাহসিক নেশা তার আজো কাটেনি।

কিন্তু এ নেশা সকলকেই যে গ্রাস করে, তা নয়। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি'—তেমনি সকলেই ভ্রমণকারী নয়, কেউ কেউ ভ্রমণের নেশা নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ে। তাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত, রোমহর্ষক কাহিনী অন্য মানুষকে প্রেরণা দেয়—ঘরের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ তাদের কাছে কারাগার বলে মনে হয়। যারা এই ঘেরাটোপ পেরোতে পারে না, তাদের কাছে অন্য দুঃসাহসী ও দুঃখজয়ী ভ্রাম্যমানদের অভিজ্ঞতা, জীবনের আশ্চর্য এক স্বাদ আনে, তাৎপর্যের সন্ধান দেয়।

ইতিহাসে ভ্রমণকাহিনীর সার্থকতা তাই মানবপ্রকৃতির এক স্বতন্ত্র দিক উন্মোচিত করে। পৃথিবীর স্মরণীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত তাই মানুষের কাছে সম্পদবিশেষ—একটা বিশেষ যুগের, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর, বিশেষ সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এই ভ্রমণকাহিনীর পাতায় পাতায়। শ্রুতকীর্তি গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মিশর ভ্রমণের কাহিনী ইতিহাসবিখ্যাত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সাড়া-জাগানো ভ্রমণকারী মার্কো পোলোর কাহিনী বিশ্ববন্দিত। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবন বতুতা ছিলেন পৃথিবীর সেরা ভ্রমণকারী। সুদূর বিদেশ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে ভ্রমণ করতে এসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনীও কেউ কেউ রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্, মেগাস্থিনিস প্রভৃতির নাম এদেশে অনেকেই জানেন।

দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী এ কারণে আকর্ষণযোগ্য উপাদান। আমাদের বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনী অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, গত কয়েক বছর ধরেই। এ বিষয়ে নানা ভ্রাম্যমান মানুষদের কাহিনী নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকাশিত হচ্ছে শোভন মলাটে এবং সচিত্র-বর্ণনায়। এ প্রসঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত, তথা সামান্য, আলোচনার অবতরণিকা করা যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণকাহিনীর শুরু খুব বেশিদিনের নয়। দেশ-বিদেশ যাঁরা ভ্রমণ করতেন, তাঁরা অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত লিখে রাখার প্রয়াসী হননি,—কোন কোন ক্ষেত্রে হলেও সে বর্ণনা, সাহিত্যের প্রাঙ্গণে তেমন কোন চিহ্ন রাখেনি।

এ প্রসঙ্গে বিগত উনিশ শতকের যে ভ্রমণবৃত্তান্তের নজির পাওয়া যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর অংশবিশেষ, সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ ভ্রমণের বিবরণ, স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' গ্রন্থ এবং রবীন্দ্রনাথের বিদেশ যাত্রার প্রথম যুগের বিবরণ ইত্যাদি।

১৮৫৬ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের স্বচ্ছ, সুন্দর এবং মাঝে মাঝে কবিত্বময় বর্ণনা, তিনি আত্মজীবনীর পাতায় রেখে গেছেন। এর আগে ১৮৪৯ সালে তিনি আসামে ভ্রমণ করেন এবং ১৮৫০ সালে জলপথে বার্মায় যান।

দেবেন্দ্রনাথের ভ্রমণ করার উৎসাহের কারণ বড় বিচিত্র: তাঁর নিজের ভাষায়—'আমি সেই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের সময় হইতে দুর্গোৎসবে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে যে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখনো তাহার শেষ হইল না। এখনো আশ্বিন মাস আইলেই আমি কোথাও না কোথাও চলিয়া যাই। এ বৎসর ১৭৭১ শকে পূজা এড়াইবার জন্য আসাম অঞ্চলে বহির্গত হইলাম"। বাড়ীতে দুর্গাপূজা সম্পর্কে বিতৃষ্ণায় যে তিনি বাইরে চলে যেতে চাইতেন, তা নয়; তার আরো গভীরতর আধ্যাত্মিক কারণ ছিল। ১৮৫৬ সালে বরানগরের কাছে গঙ্গাতীরে বসে প্রকৃতির পটভূমিকায় আত্মবিস্মৃত দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীতে স্মরণ করতেন, মুক্তিকামী আত্মার বিশ্বচারী প্রকৃতির কথা—"..আবার যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে দেখিলাম: ন ধনেন, ন প্রজয়া, ন কর্মণাত্যাগেনৈ-কেনামৃতত্বমানশুঃ। না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায়—তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলি

আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম কখন আশ্বিন মাস আসিবে, আমি এখান হইতে পালাইব, সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।"

ভ্রাম্যমান পান্থধর্মের এই উন্মাদনায় দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৬ সালের অক্টোবরে জলপথে কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন, এবং উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ শেষে ১৮৫৮ সালের নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে আসেন। প্রকৃতি ও লোকালয় বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনায় কিছুটা কবিত্বের ভাব থাকলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল কিছুটা অনাসক্ত। এই অনাসক্তি হাফিজের কবিতার উদ্ধৃতি সত্বেও উপলব্ধি করা যায়। স্থানিক বিবরণে তাজমহলের কোন উচ্ছ্বসিত বর্ণনা নেই, কিন্তু পাহাড়ের অরণ্য প্রকৃতির মহিমা বর্ণনায় আধ্যাত্মিক আবেশ স্পষ্ট: "এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল।" বনাকীর্ণ পাহাড়ী পথে অন্যমনে অনেক দূর যেতে যেতে যখন সূর্যাস্তকালীন পরিবেশে তাঁর ফেরার কথা মনে হ'ল—তখন, "আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি বন কানন সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল... ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম—আমার উপরে তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে।" দেবেন্দ্রনাথ কাশী-অমৃতসর-দিল্লী-আগ্রা-সিমলা এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করলেও, প্রকৃতির ভয়াল সৌন্দর্যে সব সময়ে ঈশ্বরের সর্বত্রসঞ্চারী অস্তিত্ব অনুভব করেছেন। এই অনুভূতিই তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তের বৈশিষ্ট্য।

স্বামী বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' নামে ভ্রমণ কাহিনীটির ভাষা মৌখিক, তথা কথ্য, গতি অফুরান জলস্রোতের মত দুর্নিবার এবং এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার সাবলীলতা বিস্ময়কর। এই ভ্রমণ-গ্রন্থে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেমন চিন্তা আছে, তেমনি তথাকথিত উচ্চবর্ণের অধোগতি এবং নিম্নবর্ণ ও অত্যাচারিত শ্রেণীর উন্নতির অমোঘ ভবিষ্যৎবাণী আছে। উচ্চবর্ণদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য: "তোমাদের বাড়ী ঘরদুয়ার মিউজিয়াম, তোমাদের আচার ব্যবহার চালচলন দেখলে বোধ হয় যেন ঠানদিদির মুখে গল্প শুনচি! এ মায়ার সংসারে আসল প্রহেলিকা, আসল মরীচিকা তোমরা—ভারতের উচ্চবর্ণেরা।" বৌদ্ধ-মুসলিম খৃষ্টান ও তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে যেমন প্রখর আলোচনা আছে, তেমনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণের সময় সেখানকার নানা জাতির বৈশিষ্ট্য

তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। "প্যারিসের পর পাশ্চাত্য জগতের আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের নকল; অন্ততঃ চেষ্টা। কিন্তু ফরাসীতে যে শিল্পসুষমার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য, জার্মাণে, ইংরাজে, আমেরিকে সে অনুকরণ স্থূল·····ফরাসীর সভ্যতা স্নায়ুময়, কর্পূরের মত, কস্তুরীর মত, এক মুহূর্তে উড়ে ঘরদোর ভরিয়ে দেয়; জার্মাণ সভ্যতা পেশীময়, সীসার মত, পারার মত ভারি, যেখানে পড়ে আছে ত পড়েই আছে।" পরিব্রাজক গ্রন্থটির উৎস হ'ল ১৮৯৯ সালে স্বামিজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদকের নিকট লিখিত এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'বিলাতযাত্রীরপত্র' রূপে উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং মধ্য প্রাচ্যের ইতিহাসের চালচিত্রের পরিচয় যে পরিব্রাজকের অন্যতম আকর্ষণ, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের খ্যাতি 'পালামৌ' নামে ভ্রমণ বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করেই; এক হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্র ও 'পালামৌ', পরস্পরের পরিপূরক। 'পালামৌ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার নিজের একটি হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।"

'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীটি, বঙ্গদর্শন পত্রিকার (১৮৮০-৮২) বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হবার পর, গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে ১৮৯৩ সালে। বিহারের পার্বত্যময় ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল পালামৌ পরগণায় সঞ্জীবচন্দ্র সরকারী কাজে গিয়েছিলেন; বেশীদিন সেখানে থাকতে না পারলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্পকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহার চিহ্ন বাংলা সাহিত্যে রহিয়া গেল।" সরস মাধুর্য এবং নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গী 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে ছড়ানো। বনভূমি-পাহাড়-বৃক্ষসারি-স্থানীয় কোল অধিবাসীর আচার-আচরণ প্রভৃতির বর্ণনায় 'মমত্ববৃত্তির কল্যাণকিরণ' ছড়ানো: "পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়, যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ।" কিন্তু পাহাড়ের পাদদেশ হোক, কিংবা ঘন জঙ্গল হোক, সেদিন সঞ্জীবচন্দ্রের মন ছিল উদাসীন শিল্পীর—"নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য থাকিলেও আমি তাই ফেলিয়া যাইতাম; চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখন ভাবিতাম না..."—কিন্তু পরবর্তীকালের স্মৃতিচারণে লেখকের মন্তব্য স্থান-

কাল-প্রেক্ষিতের অতীত : "এখন দেখি এ বেগ একা আমার নয়। যে সময়ে উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে ; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে ; জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী। সে গৃহে বসিয়াদেখে উঠানে ছায়া পড়িতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয়, আমিও পৃথিবীর রংফেরা দেখিতে যাইতাম।" সময়ের প্রভাবে মানুষের মনের যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে, সে প্রসঙ্গে একটি একশিলা পাথরের পাহাড়ের ওপর একটি অশ্বত্থবৃক্ষের বৃদ্ধি সম্বন্ধে পরিহাসরসিক সঞ্জীবচন্দ্রের মন্তব্য স্মরণীয় : "তখন মনে হয়েছিল অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রস গ্রহণ করিতেছে। কিছুকাল পরে আর এক দিন এই অশ্বত্থ-গাছ আমার মনে পড়িয়াছিল তখন ভাবিয়াছিলাম, বৃক্ষটি বড় শোষক, ইহার নিকট নীরস পাষাণেরও নিস্তার নাই।"

পালামৌ ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিত সঞ্জীবচন্দ্রের এমন কয়েকটি উক্তি প্রবাদবাক্যের প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তার মধ্যে, "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"— এই মন্তব্যটি শিক্ষিত বাঙালীর স্মৃতিতে আজো অমলিন।

রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণসাহিত্যেও অনন্য। শুধু কবিতা নয়, জীবনেও তিনি ছিলেন সুদূরের পিয়াসী। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'—এই ক্ষোভ করলেও, তিনি এই বিরাট পৃথিবীর অনেক কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন শরীরী উপস্থিতিতে, এবং তার নানা সভ্যতা ও সংস্কৃতির তীক্ষ্ণ আলোচনায়। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ উপলক্ষে নানা সরস-ধারালো-গভীর ও নন্দিত রচনায়, সে পরিচয় তিনি রেখে গেছেন।

১৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রথমবার বিদেশ ভ্রমণ করেন, তারপর জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি অসংখ্যবার ভারতবর্ষের বাইরে যান, এবং শেষবার বিদেশে যাত্রার সময়, তাঁর বয়স সত্তর পেরিয়েছে। তাছাড়া ভারতের মধ্যে নানা জায়গায় যাওয়া-আসাও ছিল অবিশ্রান্ত। এই ব্যাপক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি কয়েকটি স্মরণীয় রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্র-অনুরাগীদের কাছে তার পরিচয় অবশ্য অজানা নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত ভ্রমণকাহিনীগুলিকে তিনটি বিশেষ ভাগে ভাগ করা করা যায় : তার মধ্যে প্রথমভাগে পড়ে পাশ্চাত্যদেশীয় ভ্রমণ বিবরণ—যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র, য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারী, পশ্চিমযাত্রীর

ডায়ারী। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে জাপানযাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি ও পারস্যে, এবং তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত রচনাবলী হ'ল : পথের সঞ্চয়, পথে ও পথের প্রান্তে, জীবনস্মৃতির অংশবিশেষ ইত্যাদি।

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' রচনায় উনিশ শতকের শেষধাপের পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থার পরিচয় আছে; সেখানে কল্পরাজ্যের ইংলণ্ডের সঙ্গে সত্যরাজ্যের মিল তিনি দেখতে পাননি। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন জীবিকার জন্য এখানকার মানুষদের প্রবল যোঝাবুঝি এবং লোকজনের ব্যস্তভাব,—"সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায়, এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা"। এছাড়া বিভিন্ন নাচের আসর, কুশ্রী মেয়ের বিবাহে নারীসমাজে কোলাহল, ল্যাণ্ডলেডীকে নিয়ে বিচিত্র ঘটনা, স্ত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রসঙ্গ তো আছেই। সবচেয়ে উপভোগ্য অংশ হ'ল ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কথা—বিশেষ করে স্বদেশীয় কুসংস্কার ত্যাগ করে তাদের বিদেশীয় কুসংস্কার আঁকড়ে থাকার করুণ প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত।

'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী'তে পশ্চিমী সভ্যতার প্রবল, উন্মাদনাময় এবং উদ্যোগী পরিবেশের ব্যাপক পরিচয় আছে এবং ভারতবর্ষের স্থির, অনাগ্রাহী তথা উত্তমহীন জীবন যাত্রার তুলনামূলক আলোচনার তীক্ষ্নতা আছে। লেখকের ভাষায় "...দুর্বলদের আশ্রয়স্থান এ সমাজে যেন ক্রমশই লোপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কেবলই কার্য চাই, কেবলই শক্তি চাই, কেবলই গতি চাই......।" পশ্চিমী সভ্যতার এই প্রকৃতি ফ্রান্সে গিয়েও তিনি লক্ষ্য করেছেন, "এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে বোঝাপড়া হয়ে আসছে একদিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর একদিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে—য়ুরোপের সে ভাব নয়।" তাহ'লে তার কি ভাব? কবির ভাষায়, "য়ুরোপীয় সমাজে একদিকে যেমন বন্ধনহীন পরহিতৈষা, তেমনি বাধাহীন স্বার্থপরতা।" তাঁর সরস মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উপভোগ্য: "আমাদের যেমন প্রতিবৎসর পরিবার ওদের তেমনি প্রতিবৎসর আরাম বাড়ছে।" মনে রাখতে হবে এসব মন্তব্যের কাল আজ থেকে একশো বছর আগে।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাম্যমান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বোধ হয়, যৌবনসুলভ আসক্তির সঙ্গে আগামী জীবনযাত্রার নিরাসক্তির সমন্বয়। তাই ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যের প্রশস্তি যেমন তাঁর রচনায় অকৃপণভাবে বর্ণিত, তেমনি আর্ট একজিবিশনে, বসনহীনা নারী সৌন্দর্যের সুঠাম ও সুনিপুণ ভঙ্গিমার বিশ্লেষণে তিনি সে যুগের বাঙালী হিসাবে দুঃসাহসী। পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারীর রচনাকাল ১৯২৪ সাল;

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীময় ঘটে গেছে যেমন ওলোট পালোট, তেমনি রবীন্দ্রমানসেও পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। পশ্চিমে, বিশেষতঃ আমেরিকায়, তিনি লক্ষ্য করেছেন, বাপ-মায়ের সঙ্গে অধিকাংশ বয়স্ক ছেলেমেয়ের নাড়ীর টান ঘুচে গেছে ; তেমনি স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কে জটিলতাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। আবার সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছেন, য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির, যুদ্ধনীতির, বাণিজ্যনীতির ঘোড়দৌড় চলেছে জলে স্থলে আকাশে। অথচ এই ভীষণ দর্শনের মধ্যেও রবীন্দ্রমানস ভ্রমণের চিরকালীন সত্যকে ভোলেনি ; তাই তিনি বলেন, "আমাদের দেশে তীর্থযাত্রা ধর্মসাধনায় প্রধান অঙ্গ"—দেবতাকে অভ্যাসের পর্দায় ঘিরে না রেখে, "তীর্থযাত্রায় সেই পর্দা ঠেলে দিয়ে মন বেরিয়ে পড়ে।"

জাপানে, জাভাযাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি এবং পারস্যে শীর্ষক প্রতিটি ভ্রমণবৃত্তান্তে এই পর্দা ঠেলে বেরিয়ে পড়ার চমকপ্রদ বিবরণ আছে। স্বচ্ছদৃষ্টিতে তিনি দেখেছেন সেদিনের জাপানের উগ্র ইউরোপীয় বেশ ও চরিত্র, চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জয়ের চিহ্নগুলি পুঁতে রাখার অমানবিক বর্বরতা, সেই সঙ্গে আবার দেখেছেন জাপানী সৌন্দর্যবোধ, তাদের চিত্রশিল্প এবং জীবনযাত্রার হিসেবী মাত্রা। ঠিক সেই একই কারণে, জাভা যাত্রীর পত্র রচনায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাচীন ও সেদিনের পরিচয়ের সঙ্গে আমরা জানতে পারি দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথকেও, যিনি লক্ষ্য করেছেন সেখানকার ভাব-রীতি-নীতির সঙ্গে হিন্দু মানসিকতার মিল, এদেশের মানুষের ওপর মহাভারতের কাহিনীর প্রভাব,—তাদের নাচের বৈশিষ্ট্যে এবং মন্দিরের কারুকার্যে।

রাশিয়ার চিঠির সময়কাল ১৯৩০ সাল—তখন কবির বয়স প্রায় ৭০—তখন এক নতুন সমাজব্যবস্থা, তার অভিনব কাণ্ড-কারখানা দেখে বিস্মিত রবীন্দ্রনাথের সচেতন সাড়াও মনে রাখার মত : "কোনো মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা হয়ে না থাকে এজন্য কী প্রচুর আয়োজন ও কী বিপুল উদ্যম। ·····প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কি হয়েছে আর কী হতে পারত।" অবশ্য এই সঙ্গে এদের শিক্ষাবিধির ছাঁচে ঢালা ব্যবস্থার গলদও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তাহলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন—"আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

জমিদারীর কাজে বাংলার চাষীদের চেহারা-চরিত্র সম্পর্ক কিছুটা অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে রাশিয়ার চাষী সম্প্রদায়ের উল্কাপ্রতিম অগ্রগতি দেখে বিস্মিত হয়েছেন—তেমনি দেখেছেন, "যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল

তাদের চিত্তের আবরণ উদ্ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক ·· ।" রাশিয়া ভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে সব দেশে তিনি ঘুরেছেন; তারা সমগ্রভাবে তার মনকে নাড়া দেয়নি। কিন্তু রাশিয়ার ক্ষেত্রে তিনি দেখেছেন, একটা অখণ্ড সাধনা, এক বিরাট অভিপ্রায়ের মুখে সমস্ত দেশটা এগিয়ে চলেছে। উপনিষদের বাণী দিয়ে তিনি এই অবস্থার সুন্দর প্রতিতুলনা রেখেছেন – তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে।"

১৯৩২ সালে, ক্লান্ত শরীরে রবীন্দ্রনাথ পারস্য ভ্রমণে যান। 'পারস্যে' এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রাচীন ইতিহাসের অনেক বিশ্লেষণ আছে যা সত্তর-পরবর্তী কবির কাছে আমাদের প্রত্যাশার অতীত। শরীর জীর্ণ হলেও মন জীর্ণ হয়নি, পারস্যে ভ্রমণ-কাহিনীতে তার প্রচুর চিহ্ন ছড়ানো। সে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যেমন পারস্যরাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, তেমনি মরু-অঞ্চলে বেদুইনদের তাঁবুতে বেদুইন দলপতির সঙ্গে আলাপে ও সরস আলোচনাতেও: "আমার বেদুয়িন নিমন্ত্রণকর্তাকে বললুম যে বেদুয়িন আতিথ্যের পরিচয় পেয়েছি কিন্তু বেদুয়িন দস্যুতার পরিচয় না পেলে তো অভিজ্ঞতা শেষ করে যাওয়া হবে না।" এর উত্তরও সুন্দর: "আমাদের দস্যুরা প্রাচীন জ্ঞানীলোকের গায়ে হস্তক্ষেপ করে না।"

অন্নদাশঙ্কর রায় রবীন্দ্রনাথকে জীবনীশিল্পী বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ার পর তাঁকে বিশ্বমানবশিল্পী বলে অভিনন্দন জানাতে ইচ্ছে করে।

[২]

বিদেশ যাত্রার জোয়ারে বাংলা সাহিত্যের ভূগোল, বিশেষ করে ভ্রমণসাহিত্যে, প্রবলভাবে প্রসারিত। অনেক ভ্রাম্যমানই নিজেদের অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে-ছেন; তার অধিকাংশ সম্পর্কে আলোচনা করার অবকাশ অল্প। কয়েকটি প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা সম্পর্কে আলোচনা, আশা করি, অন্যান্য গ্রন্থ সম্পর্কে অনীহা বোঝাবে না। এই সব ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল অন্নদাশঙ্কর রায়ের "পথে ও প্রবাসে", ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "ঘরের ছেলে বাহিরে" এবং রামনাথ বিশ্বাসের কয়েকটি অনবদ্য ভ্রমণকাহিনী।

বিচিত্রায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পর থেকে 'পথে প্রবাসে' বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষন করে; এবং প্রমথ চৌধুরী পথে প্রবাসে গ্রন্থটির ভূমিকা লিখে দেন।

বইটির খ্যাতির প্রধান কারণ, লেখকের সপ্রতিভ ও সাবলীল ভাষা, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রসদীপ্ত বুদ্ধিতে উজ্জ্বল; পড়ার সময় পাঠকের চমক লাগে, অন্ততঃ সেদিনের পাঠকের যে লেগেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন—"এটা পুনর্যাযাবরতার যুগ, আমরা সকলকেই চাই। কাউকেই চাই না, আমাদের আলাপী বন্ধু শত শত কিন্তু দরদী বন্ধু একটিও নেই;—কিংবা, "দেহরক্ষার জন্য সে দেশে এত রকমের এত কিছু তোড়জোড় চাই যে, তার আহরণে সামান্য অনবহিত হলে 'দেহরক্ষা' অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য দেহ থেকে দেহোত্তরে উঠতে হয় উপনিষদ লিখতে, নয় মোহমুদ্‌গর লিখতে ইউরোপের লোক কোনদিনই পারল না।" 'পথে প্রবাসে' গ্রন্থটির আদ্যন্ত এই বুদ্ধিদীপ্তির চাতুর্য ছড়ানো। লেখকের ভ্রাম্যমান দৃষ্টিতে ক্ষণিকের দীপ্তি আছে, কিন্তু সার্চলাইটের দূরবিসর্পী ব্যাপ্তি নেই। তাঁর লেখার পটভূমি আকাশ থেকে দেখা দৃশ্যপ্রতিম; এ কারণে তাতে সাধারণীকরণ আছে প্রচুর, এবং সেই কারণেই তা উপভোগ্য। "পথে প্রবাসে"-র মূল বক্তব্য ইউরোপকেন্দ্রিক। ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জার্মানী-সুইজারল্যাণ্ড-ইতালী প্রভৃতি দেশের জীবনচর্যা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি প্রভৃতির তাৎক্ষণিক পরিচয়ে সমগ্র রচনাটি সমৃদ্ধ। কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য; "ইংলণ্ডের গণতন্ত্রে অভিজাতদের ক্ষমতা কমেছে কিন্তু প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ এদেশ কুলীনকে অন্ত্যজ না করে অন্ত্যজকে কুলীন করে তুলে তুলেছে।" বাক্‌পটুতায় কুলীন বাঙালীর কাছে ইংরেজদের কথাবার্তা নিতান্ত নীরস ও নিরেস; "এরা বাচাল নয় বটে, কিন্তু, বাকপটুও নয়। কথোপকথনের আর্ট এদের অজানা।" তুলনায় ফরাসীরা আমাদের বাঙালীর মত—"গোলমাল ভালবাসে, অতিরিক্ত রকমের বাচাল, আর বাদশাহী রকমের কুঁড়ে।" আবার, "লণ্ডনের লোক এক নম্বরের শুচিবায়ুগ্রস্ত। পারীর লোক বিবসনা স্ত্রী মূর্তি দেখে শকড্‌ হবে, এমন কচি খোকা নয়।" অন্যত্র, "জার্মানরা স্বভাবত যোদ্ধা নয়, বোদ্ধা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিচিত্র দাবী প্রত্যেক জাতিকেই কতকটা স্বভাবভ্রষ্ট হতে বাধ্য করেছে, জার্মানীকেও।"

ইটালী প্রসঙ্গে মন্তব্যও শ্রুতিসুভগ: "ইটালী যেন আমাদের দেশ...নারীর মুখে সুকুমার কমনীয়তা এবং বেশে ও কেশে সেকেলে রীতি। ভিক্ষুক ও সন্ন্যাসী ভগবানের মত সর্বত্র অবস্থিত।" এবং সবশেষে—"ইউরোপকে আমি না দেখেই ভালোবেসেছিলুম। দেখেও ভালবাসলুম। ইউরোপ আমাকে চিরকাল আকর্ষণ করে এসেছে।..." দুঃখের বিষয়, অন্নদাশঙ্কর রায় ও তাঁদের সহধর্মীদের, ভারতবর্ষ, সম্ভবত আকর্ষণ করেনি, এবং তাঁরা অন্তর দিয়ে ভালোবাসেননি

এই দেশকে। তাই লেখার ছত্রে ছত্রে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অবজ্ঞা যেমন অর্থবহ, তার সম্পর্কে মমতার চিহ্নে কার্পণ্য তেমনি বিস্ময়কর। বুদ্ধ, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ সম্পর্কে উদাসীন এই সব পাশ্চাত্য প্রেমিকেরা কোনদিন ভেবে দেখেননি, ইউ-রোপীয় মানসিকতার জাগ্রত বিবেকরূপে বন্দিত রোমা র‍ঁলার মত মানুষ রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের জীবনী রচনায় কেন ছিলেন অক্লান্ত।

"ঘরের ছেলে বাহিরে" গিয়ে যে সব তরুণ ভাগ্য অন্বেষণে বিচিত্র, সংগ্রামী ও কঠিন পরিবেশে জড়িয়ে পড়েছেন, ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের বইটি তাদের কঠোর জীবনচর্যার প্রতিনিধিত্বমূলক রচনা। অর্থাৎ সরকারী আনুকূল্যে নয়, পিতৃদত্ত অর্থের প্রাচুর্যে নয়—নিজের ওপর অদম্য বিশ্বাসকে পাথেয় করে, জীবিকা অর্জনের দুর্জয় সঙ্কল্পে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার পর সেখানকার রূঢ় অভিজ্ঞতা, এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছু আগে ভারতবর্ষ থেকে জাপানে যান ধনগোপাল ; সেখান থেকে পাড়ি দেন আমেরিকায়। আমেরিকায় গিয়ে শুরু হয় কঠোর জীবন—ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন ধোওয়া থেকে শুরু করে কারখানার নারকীয় পরিবেশে কাজ, সেইসঙ্গে কলেজে লেখাপড়া, নৈরাজ্যবাদী কিছু ভবঘুরে যুবকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদি, বইটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলেছে। নানা রঙীন বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করে ধনগোপাল, পাশ্চাত্য সভ্যতার তলানি-ময়লা-নোংরামির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ; তাঁর চোখে ধরা পড়েছে এই সভ্যতার সমস্ত জয়াচুরী, ভণ্ডামী ও বর্বরতার রূপ। অথচ তারই মধ্য থেকে অসীম অধ্যবসায়ে তিনি নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। তারই পরিণতিতে ইংলণ্ডের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে যেমন বক্তৃতা দেবার সুযোগ এসেছিল, তেমনি ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল রাসেল, ওয়েলস্, বার্ণাড শ' প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে। তাঁর কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : "সহৃদয় বা উদার চিত্ত হবার মত য়ুরোপ যেমন প্রবীণ নয়, আশীর্বাদ গ্রহণ করার মত আবার তেমন সে তরুণও নয়, য়ুরোপে গ্রীসের বাইরে এমন কোন কিছু নেই যাতে হিন্দুর মর্ম স্পর্শ করতে পারে। হিমালয়ের আকাশ, বুভুক্ষা বা ভারতীয় অরণ্যাশ্রমের ভীষণ অদৃষ্টবাদের তুলনা সারা য়ুরোপে কোথাও মেলে না।" অন্যত্র আমেরিকা সম্পর্কে বলেছেন, "এশিয়ার রহস্যবাদ, য়ুরোপের বিচিত্র রসাশ্রিত কালচার ও আফ্রিকার অজ্ঞানতাজাত সততা সবই সমান আদরে এ ভূমিতে স্থান পেয়েছে। আমেরিকা বিজয়ী কিন্তু ভারত পর-পদানত। আমেরিকা চিন্তাহীন, ভারত চিন্তাজীর্ণ ; আমেরিকা তার নিগ্রোদের নৃশংসভাবে হত্যা করে আর ভারত তার অস্পৃশ্যদের কুব্যবহারে জর্জরিত করে। ভারত শান্তির লোভে আর

আমেরিকা চাঞ্চল্যে একেবারে আত্মহারা। তাদের উভয়ের এই আত্মবিস্মরণ, এই উন্মাদনা আমায় আকৃষ্ট করেছে।" প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হিসেবে "ঘরের ছেলে বাহিরে" অনুবাদগ্রন্থ হ'লেও, বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে অভিনব সংযোজন।

রামনাথ বিশ্বাস একজন জাত ভূ-পর্যটক। সারা পৃথিবী ঘুরে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা কয়েকটি গ্রন্থের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ১৯৩১ সালে শ্রীবিশ্বাস তাঁর কর্মক্ষেত্র সিঙ্গাপুর থেকে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন, এবং তিনবার চেষ্টা করার পর পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী হ'ল মরণ-বিজয়ী চীন, ভয়ঙ্কর আফ্রিকা, আফগানিস্থান ভ্রমণ এবং তরুণ তুর্কী। স্থানাভাবে শেষ দুইটি গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

রামনাথ বিশ্বাস চিন্তায় ও চেতনায় পৃথিবীর নির্যাতিত, পরাধীন এবং সংগ্রামী মানুষদের সপক্ষে। নানা দেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর মানসিক শক্তির যে অফুরান প্রকাশ ঘটেছে, তা তাঁর লেখার মাধ্যমেই বোঝা যায়। কোরিয়া ভ্রমণকালে তিনি সে দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের আভাস পান। জাপানীদের অধীনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কোরিয়ায় জাপানী ও কোরিয়ানদের সংস্কৃতির সমন্বয় বড় বিচিত্র: "কোরিয়াতে একটা প্রবাদ আছে যে, জাপানী কেরানী, কোরিয়ান মজুর এবং চীনাদের বুদ্ধি একীভূত হলে পৃথিবী জয় হয়।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালেই ভ্রাম্যমান শ্রীবিশ্বাসকে কয়েকজন কোরিয়ান ও জাপানী বন্ধুরা প্রশ্ন করেন, 'ভগবান বুদ্ধ যে মত প্রচার করে গেছেন তাতে জগতে শান্তি আসবে? রামনাথ বিশ্বাস এর উত্তর সঙ্গত কারণেই এড়িয়ে যান, কারণ সে সময় "এখানে লেনিনের মত পোষণকারীদের যমালয়ে পাঠান হয়, তাই নীরব থাকাই পছন্দ করলাম।" লেখকের ধারণা অনুযায়ী কোরিয়ানরা পরাধীন হবার পর যত বিদ্রোহ করেছে তেমনটি আর কেউ করেনি।

মুস্তাফা কামাল, যিনি আতাতুর্ক নামে পরিচিত, তুরস্কের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে যে বিরাট বিপ্লব এনেছিলেন, "তরুণ তুর্কী" ভ্রমণবৃত্তান্তে তার একটি ঘরোয়া পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সুলতানী আমলে তুরস্কে মোল্লা-মসজিদ কেন্দ্রিক জীবন-যাত্রায় যেখানে ভিখারী-বারবনিতা-ভবঘুরে-অন্ধ-খঞ্জ-সমাজবিরোধী-দের প্রভাবে মধ্যযুগীয় পরিবেশ ছিল অনড়; আতাতুর্কের ক্ষমতা দখলের পর সে সব অদৃশ্য, অর্থাৎ সরকার তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছে। বোরখা প্রথা

গেছে উঠে, প্রতিটি গ্রামেই খোলা হয়েছে স্কুল, মজুরেরা যে সমাজের অংশ তা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্বের ব্যবস্থা সরকারের হাতে। এই সর্বগ্রাসী পরিবর্তন সেদিনের আরবদের এবং ভারতীয় মুসলমানদের চোখে মোটেই ভালো লাগেনি। ফলে তরুণ তুর্কীদের কাছে আরবরাও শত্রুরূপে গণ্য; বিদেশী পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসকেও মাঝে মাঝে আরব বলে ভুল করা হয়েছিল। ইউরোপীয়দের মত এদেশের লোকেদের ধারণা হিন্দুস্থানের প্রতিটি লোকই হস্তরেখাবিদ, যদিও তুরস্কে হাত দেখানো বে-আইনী, এবং তা থেকে টাকা রোজগার করলে কয়েক মাসের হাজতবাস অনিবার্য। এই সব ভ্রমণকাহিনীর বিস্ময়কর ব্যাপারটি হ'ল সাহসে ভর করে বিদেশ যাত্রায় ব্রতী হলে ভাষা কোন বাধা নয়; পর্যটকের অভিজ্ঞতায় চূড়ান্ত অসুবিধার সঙ্গে; হার্দ্য আতিথেয়তাও দুর্লভ নয়। তুরস্কের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সেদিনের ভারতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে রামনাথ বিশ্বাসের মন্তব্য তাৎপর্যজনক (আজ থেকে ৪০।৪৫ বছর আগে): "আমাদের দেশের নেতারা চান বৃটিশকে তাড়িয়ে দিয়ে বৃটিশের স্থানে নিজেরা বসতে। মজুর, কৃষক, হরিজন, ছোটলোক যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। এইজন্যই বোধ হয় তারা ছোটলোক অথবা বিত্তহীন শ্রেণীর ভূপর্যটককে দর্শন দিয়ে উঁচুতে ওঠাতে চান না। কলকাতার এক সংবাদপত্রের মালিক বলেছিলেন —ছোটলোকের ছেলেটাকে বেশী পাবলিসিটি দেবেন না।" স্বদেশে বিদেশে ভ্রাম্যমানের অভিজ্ঞতা অবশ্যই কখনো তিক্ত কখনো মধুর।

(৩)

বাংলা ভ্রমণসাহিত্য হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, বিশেষ করে উত্তর ভারতের বিচিত্র ও দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণাঢ্য বর্ণনা নানা কারণে আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে বেশ কিছু ভ্রাম্যমান প্রচুর গ্রন্থ লিখেছেন এবং লিখে যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে, প্রথম যুগের লেখকদের তিনজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা হলেন জলধর সেন, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধকুমার সান্যাল।

জলধর সেনের 'হিমালয়' নামে বইটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে ভ্রমণকাহিনী বাংলা সাহিত্যে যে দুর্লভ ছিল, তা নয়—হিমালয়ের পাহাড়ী ও অজানা পরিবেশে ভ্রমণ করার ঘটনাও ছিল বিরলতম। সে হিসাবে তাঁর গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে হিমালয় সম্পর্কে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ।

১৮৯০ সালের ৬ই মে তাঁর যাত্রা শুরু হয়, এবং প্রত্যাবর্তন ঘটে জুন মাসের মাঝামাঝি। তাঁর ভ্রমণ বর্ণনা ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, দীনেন্দ্রকুমার রায়ের আন্তরিক আগ্রহে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার সময় (অর্থাৎ প্রথম সংস্করণের তারিখ), আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু বইটির দশম সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৩৭ সালে। ডায়েরীর আকারের লিখিত এই ভ্রমণকাহিনীতে দেবপ্রয়াগ-শ্রীনগর-রুদ্রপ্রয়াগ-কর্ণপ্রয়াগ-নন্দপ্রয়াগ যোশীমঠ-পাণ্ডুকেশ্বর-বদরিকাশ্রম এবং বদরিনাথের বিস্তৃত বিবরণ আলাদা আলাদা অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র রচনাটি বর্ণনাত্মক, সরল-সহজ-স্বচ্ছ ভাষায় লেখা। যোশীমঠ শীর্ষক অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য এবং তাঁর প্রতিভাদীপ্ত কর্মধারার পরিচয় আছে। তাঁর মতে বদরিকাশ্রমে ভ্রমণের কষ্ট স্বীকারের চেয়ে যোশীমঠে আসার কষ্ট অনেক সার্থক, ভারতীয় সাধনার গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারের জন্য। ২৯০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির মধ্যে নানা ঘটনা এবং বিচিত্র দুঃখজয়ী পথযাত্রার বিবরণ আছে। তার মধ্যে একটি ঘটনা সত্যিই চমকপ্রদ। যোশীমঠে যাবার পথে লেখক ও তাঁর সঙ্গী এক স্বামীজীর, স্থানীয় একটি আট বছরের ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। "সে আমাদের তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে অবশেষে বল্লে 'বাপ্‌জী নে বোলা কি স্বামী লোগোঁকি সাথ্ নারায়ণজী বাতচিৎ করতা হ্যায়, তুম্‌হারা সাথ্ নারায়ণজীকো কেয়া বাৎ হুয়া ?'—প্রশ্ন শুনে আমার চক্ষু স্থির: ভেবে চিন্তে বল্লুম, 'হামা-রা সাথ্ আবি তক্ নারায়ণজীকা মূলাকাত নেই হুয়া'। আমার কথা শুনে বালক কিছু বিরক্ত হয়ে বল্লে, 'আরে তব্ কাহে ঘর ছোড়্‌কে সাধু হুয়া ?' কথাটা বালকের বটে; কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর ভাবই লুকান ছিল!—আমি ধার্মিক নই, সাধুও নই। কেবল সাধুর দলে পড়ে এই সব নিগ্রহ ভোগ করছি।"

জলধর সেন আরো কয়েকটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। তার মধ্যে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ "প্রবাসচিত্র" গ্রন্থটি উল্লেখের দাবী রাখে। গুরুদ্বার, মুশৌরি, সহস্রধারা, উত্তরকাশী প্রভৃতি স্থানের বর্ণনায় বইটি সে যুগের পাঠকের যথেষ্ট মনোযোগ যে দাবী করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সহস্রধারা নামে যে বিখ্যাত ঝর্ণা উত্তর ভারতের পার্বত্যভূমিতে সুন্দর দৃশ্য হিসেবে ভ্রাম্যমান-দের কাছে মধুর আকর্ষণরূপে গণ্য—তা'র বর্ণনায় জলধর সেন রীতিমত কবিত্ব করেছেন: "দুই দিকে অত্যুচ্চ পর্বত; পর্বতগাত্রে সহস্র প্রকার সুন্দর পুষ্প বিকশিত······আমার মনে হইল ত্রিদিবের নন্দনকানন বুঝি এই রকম, মন্দাকিনীর

স্ফটিক প্রবাহ এমনই নির্মল ও শুভ্র ; দেববালাগণের অমর-সংগীত বুঝি এই বিহগকাকলীর মতই মধুর ....।" গুরুদ্বার শীর্ষক আলোচনায় দেরাদুন শহরের উৎপত্তির বিবরণ আছে। শিখগুরু রামরায় উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে গাড়োয়াল রাজের দাক্ষিণ্যে একটি মন্দির স্থাপন করেন আঠারো শতকের প্রথম দশকে। সেখানে প্রচুর জনসমাগম ঘটত। "প্রথমে ইহার নাম ছিল গুরুদ্বার বা গুরু দেরা ; ক্রমে ক্রমে 'গুরু' লোপ পাইয়া ইহা 'দেরা' নামেই প্রসিদ্ধ হইল ও 'দুন' প্রদেশে অবস্থানের জন্য 'দেরাদুন' এই পূর্ণনাম গ্রহণ করিল।" "জলধর সেন "দক্ষিণাপথ" ও "মধ্যভারত" নামে সচিত্র আরো দুটি ভ্রমণ-কাহিনী লিখেছিলেন।

'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' খ্যাত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায় যদিও আধ্যাত্মিক কারণে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে ভ্রমণ করেছেন, কিন্তু তাঁর ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে রয়েছে বিচিত্র সম্মোহন। প্রথম যৌবনে সংসারের প্রতি সাময়িক অনীহায় বহু তীর্থেই তিনি ঘুরেছেন, অথচ তাঁর ভ্রমণকাহিনীর রস আলাদা ধরণের। তিনি নিজে ছিলেন কুশলী ও কৃতী চিত্রকর, ভ্রমণ করেছেন সম্পূর্ণরূপে কোন পিছুটান না রেখে, এবং অসাবধানী পাঠকও লক্ষ্য করবেন তাঁর বর্ণনায় অজানা এক রহস্যের ছায়াপাত। প্রমোদকুমারের অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে হিমালয়ের পারে মানস সরোবর ও কৈলাস, যমুনোত্তরী হতে গঙ্গোত্রী ও গোমুখ, এবং হিমালয়ের মহাতীর্থে প্রভৃতি গ্রন্থগুলি, ভ্রমণ-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। তার মধ্যে প্রথমোক্ত গ্রন্থটি বিস্তৃত বিবরণের ব্যাপকতায় হিমালয়পারের দুর্গম রাজ্যের মহাকাব্য বিশেষ। এই বইটির আর একটি আকর্ষণ হ'ল লেখকের হাতে আঁকা পার্বত্য দৃশ্য ও গ্রামাঞ্চল, ভয়াল চড়াই-উৎরাই, স্থানীয় অধিবাসীদের আকৃতি ও নানা বন্ধুর পথরেখা। এছাড়া তিব্বতের পল্লীনারী, লামাদের আকৃতি, মঠের দৃশ্য, মানসসরোবরের কাছে উষ্ণ প্রস্রবণ প্রভৃতির স্কেচ, হিমালয়ের বিপুল বৈচিত্র্যের রূপ পাঠকের চোখে মেলে ধরে। বিপদ-সঙ্কুল পথের চমকপ্রদ বিবরণ যেমন এ গ্রন্থের আকর্ষণ, তেমনি হিমালয়পারে তিব্বতের সুদূর পার্বত্যভূমির ভৌগোলিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয়, সে যুগের বাঙালী পাঠককে অবশ্যই চমৎকৃত করেছিল। বলা বাহুল্য এই পথ-পরিক্রমা অত্যন্ত বিপজ্জনক,—প্রকৃতির ভয়ালতায় ; কৈলাসের পথে সেই বিজনভূমিতে ডাকাতের দল সেদিন দেখা যেত, কোথাও চোখে পড়ত ভিখারীর দল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পরিবেশ ও শুকনো বাতাস, ১৫।১৬ হাজার ফিট উঁচুতে, যে কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, সমতলবাসীর পক্ষে তা বোঝা অসম্ভব। আবার কৈলাস পাহাড়কে বেষ্টন করে যে ৩২ মাইল পথ

আছে, তা প্রদক্ষিণের জন্য তীর্থযাত্রীদের মরণপণ কষ্টসহিষ্ণুতা বিস্ময়কর। প্রমোদ-কুমারের ভাষায়, "কৈলাসের প্রত্যক্ষ দৃশ্যটি সৌন্দর্যবর্জিত, কেবলমাত্র বিভিন্ন আকারের রুক্ষ পাষাণময় শরীর, তাহার মধ্যে বিশাল শূন্যতা—যা, অনুভব সাপেক্ষ। ইহাতে আনন্দের বেগ তো নাই-ই পরন্তু গম্ভীর অচঞ্চল—। দর্শনেন্দ্রিয়-মস্তকর-দৃশ্য কিছুই না থাকায় চৈতন্যের লক্ষ্য, এই রুক্ষ বহুদূর বিস্তৃত পাষাণের অন্তরালে যেন একটা শূন্য ভাবের উপর গিয়া পড়িতেছে, এরূপ বোধ হইল… ।"

"যে মুহূর্তে মানস-সরোবর নয়নগোচর হইল, মনে হইল আমি যেন ইহার সঙ্গে বহু যুগযুগান্তর ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত আছি জীবনে ইহার সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই, কথনো হইবে না……" কিন্তু ধূসর বর্ণের পর্বতমালার রাজত্বে, "সাধারণ রূপপিপাসু-গণের চক্ষে এ দৃশ্য মোটেই সুখকর নহে। সরোবরের নীলাভ জলরাশি ব্যতীত চারিদিকের সকল দৃশ্যই নয়নের অরুচিকর।" প্রমোদকুমারের মতে স্থূল ও বাহ্যরূপের নেশার ঘোর যাদের কাটেনি, "তাহাদের এত কষ্ট সহ্য করিয়া কৈলাস ও মানস সরোবরে আসিয়া তৃপ্ত হইবার কিছুই নাই। সুতরাং ফলও কিছুই নাই। ইহার শোভা আর এক শ্রেণীর জীবের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।"

পর্যটন-ব্যবস্থার নানা উন্নতির ফলে যমুনোত্তরী গঙ্গোত্রী-গোমুখ দর্শনলাভে অনেকেই ধন্য হয়েছেন। প্রমোদকুমারের ভ্রমণের আনুমানিক কাল বাংলা ১৩২৩ সাল, অন্তত তাঁর গ্রন্থের পথের নক্শায় সেই সালই কথিত। আজ থেকে ৬০।৬৫ বছর আগেকার দুঃসাহসিক ভ্রমণের বিবরণ তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। সে বর্ণনার পরিচয় সম্প্রতিকালে বাহুল্য মাত্র। কিন্তু এই বইটিতে "মরকত রাজ্য" নামে একটি আশ্চর্য অধ্যায়ের বর্ণনা আছে, যার রহস্য, অতীন্দ্রিয় পরিবেশ এবং সেখান-কার বিচিত্র দেবোপম পুরুষ ও দেবকন্যাপ্রতিম রমণীদের সান্নিধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতার বিবরণ, বিচিত্র ও দুর্জ্ঞেয় পথ পরিক্রমার আশ্চর্যতম চিত্র।

কীর্তিমান কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল ভ্রমণ-সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর সম্প্রতিকালের ভক্ত পাঠকেরা আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি একথা বলি যে, তাঁর দেবাতাত্মা হিমালয়-এর চেয়ে খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে মহাপ্রস্থানের পথে-নামে বিগত যুগের ভ্রমণকাহিনী, পাঠকদের কাছে আকর্ষণযোগ্য। সম্প্রতি-কালের সাহিত্য-প্রিয় সব শিক্ষিত বাঙালীর কাছে এটি যে প্রিয় গ্রন্থ তা বলাই বাহুল্য। এক হিসেবে এই বইটি পরবর্তীকালের প্রায় সব ভ্রমণকাহিনীর গঠন ও প্রেক্ষিতের ধারা নির্দিষ্ট করেছে। কাহিনীর মধুর-করুণ গতির সঙ্গে ভ্রমণের বর্ণনা,

এ বইটির বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালের ভ্রমণকাহিনীকারেরা কিন্তু কাহিনী তথা রোমান্স রচনায় যতটা দৃষ্টি দিয়েছেন, ভ্রমণবৃত্তান্তে ততটা দেননি।

তার মৌল কারণ প্রবোধকুমার একদিকে যেমন কুশলী ও কৃতী সাহিত্যিক অন্যদিকে তেমনি চিরতরুণ ভ্রাম্যমান। দেবতাত্মা হিমালয় (দুই খণ্ডে) নামে তাঁর বহুশ্রুত গ্রন্থে এই দ্বৈত-পরিচয় প্রায় প্রতিটি পাতায় ছড়ানো। অসংখ্য আলোক চিত্রে শোভিত এই গ্রন্থে ভারতের চিরকালীন রূপ বিস্ময়কর ও প্রখর বর্ণনায় প্রসারিত। ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় হিমালয়ের পার্বত্যভূমি ও গাঙ্গেয় উপত্যকার ঐশ্বর্যে সমাহিত—এই তত্ত্বে আস্থা রেখেছেন লেখক। দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাজার মাইল এবং প্রস্থে কোথাও পাঁচশো মাইল, তুলনাহীন হিমালয় পরিক্রমা এক জীবনে সম্ভবপর নয়; তাই "পথ অনেক দূর, অনেক দুরারোহ। তা হোক হৃষীকেশ থেকে চলো······নদী পেরিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে উপত্যকা ছাড়িয়ে চলো দূর থেকে দূরে",—কারণ "তুমি ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত, পথের অচ্ছেদ্য টান তোমাকে টেনে নিয়ে চলেছে ···অবশেষে তুমি বিশ্রাম নাও গঙ্গোত্তরীতে গঙ্গামন্দিরে। চেয়ে থাকো গঙ্গার আদি আরও অন্তে – গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর, প্রায় দু'হাজার মাইল দেখবে পৃথিবীর কোথাও কোনো জাতির কোনো সংস্কৃতি একটি মাত্র নদীকে এমন করে জাতির প্রত্যেকটি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এমন শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সঙ্গে গ্রহণ করেনি।"

পশ্চিম সীমান্তের হিমালয় পূর্বে কালিম্পঙ পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্যভূমিতে লেখকের আনাগোনা। তার মধ্যে রয়েছে আফ্রিদী পাঠানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নেপালে গুর্খা জাতির বীর্যবত্তা ও নিষ্ঠুরতার কাহিনী, আছে কাশ্মীরি রমণীদের করুণ ইতিহাস। এই গ্রন্থে অমরনাথ যাত্রার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা যেমন রোমহর্ষক, তেমনি পরিবেশ বর্ণনায় প্রাকৃতিক অপ্রাকৃতিক অস্তিত্বের মিশ্রণে ছায়াচ্ছন্ন অভিজ্ঞতার কাহিনী রোমাঞ্চকর। কোথাও পথ বিপজ্জনকভাবে পিছল —"একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ, একটি মুহূর্তের অন্যমনস্কতা······তারপর মৃত্যু দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত" আবার কোথাও ধবল তুষার শোভার নীচে বিশাল হ্রদ। স্থির যেন নীলাভ জল—"যদি কল্পনা করি, জ্যোৎস্না রাত্রে, এই স্বচ্ছ নীল জলে অবগাহন করতে আকাশ থেকে নেমে আসে কিন্নরী আর অপ্সরীর দল, তাহ'লে সেটা সত্য মনে হবে···আমরা তাদেরকে ধ্যানে পাই, ধারণায় পাই,—কিন্তু ধারণে পাইনে"। কিন্তু তীর্থযাত্রায় আত্মবিস্মৃত মানুষ কি পায়? " বৃষ্টিমুখর ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মৃত্যুহিম পথে ভ্রাম্যমান পায় রস; কারণ রসো বৈ সঃ। রস আছে

বলেই তীর্থ, তিনি রসময়। নৈলে কেন মানুষ ছোটে কালীঘাট ছেড়ে কামাখ্যায় ? "যদি কেউ প্রশ্ন করে ঈশ্বরকে চাও না অমরনাথ যেতে চাও ? তৎক্ষণাৎ জবাব দেব, ঈশ্বর আপাতত থাক। অমরনাথ যেতে চাই। অমরনাথ যাত্রায় রস।" তার আশ্চর্ষ শুভ্র সৌন্দর্যেই রস। প্রবোধকুমারের বর্ণনায় কবিত্বে ও ভ্রমণের কাহিনী-স্থাপত্যে এমনই আশ্চর্ষ এক রস ছড়িয়ে আছে ; তাই 'বিগত বাইশ বছর ধরে' যে প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনি হয়রান হয়েছেন, সেই প্রশ্নই অমরনাথ যাত্রায় এক সঙ্গিনী তাঁকে করে বসলেন : "মহাপ্রস্থানের পথে'র রাণী মেয়েটি কে ? এখন তিনি কোথায় ? আপনার সঙ্গে কি আজো তাঁর দেখা হয় ?"

দুটি খণ্ডে মোট ২৪টি পর্বে হিমালয়ের বিশাল বৈচিত্র্য বর্ণনা করেছেন লেখক, তাঁর মধ্যে কাশ্মীর বর্ণনায় রয়েছে তার প্রাচীন-আধুনিক ইতিহাস ; তার প্রকৃত সৌন্দর্য শ্রীনগরের সমতা থেকে আরো উঁচুতে। আবার ভারতীয় সংস্কৃতির অসাধারণ বৈচিত্র্যের চিত্র বর্ণিত কাংড়ার পরিবেশ। যান্ত্রিক সভ্যতা পোষাকে-খাদ্যে-জীবনচর্যায় সকলেই একই ছাঁচে ঢেলেছে। কিন্তু, "এসো ভারতবর্ষে—অনন্ত বৈচিত্র্য আজো দেখতে পাবে। এসো হিমালয়ের পাদপর্বতে—এই কাংড়ায়। এখানে মানুষ আপন স্বভাবধর্মে বিদ্যমান"। কিংবা দেবলোকপ্রতিম প্রকৃতি বর্ণনায় বোঝা যায় প্রবোধকুমারের ভাষায় কুহক : 'বস্তুত কুলু উপত্যকা বলতে যা বোঝায় তা হোলো বিপাসা নদীর দুই পার মাত্র · পৃথিবী এখানে আশ্চর্ষ... সমগ্র সত্তার সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে কে যেন অদৃশ্য হস্তে খুলে ধরেছে অমরাবতীর দ্বার। দেখে নাও প্রাণ ভরে—যা স্বপ্নলোকের দিশাহারা পথেও কোনোদিন দেখোনি। ওই নদীর নীচে কোথাও বসে যাও, কিংবা এসো বনচ্ছায়ায়,—ওক, জুনিপার, চীড় কিংবা স্প্রুসের তলায় গিয়ে নির্জনে ব'সো তপস্যায়...শুধু যে তোমার জীবন কেটে যাবে তা নয়,—ঈশ্বরকে হয়ত বা পেয়ে যাবে সহজে।"

দুটি খণ্ডেই আলোকচিত্রের সংগ্রহ দেখবার মত, এবং দেখাবার মত। বিশেষ করে তুষারাচ্ছন্ন কুলু উপত্যকা, মানালীর অরণ্যলোক, নৈনীতালের রাজপথ, মানস-সরোবর ও নীলকণ্ঠ পাহাড় প্রভৃতির ছবিগুলি স্মৃতির পটে চিরদিন ধরে রাখার মত। সব মিলিয়ে দেবতাত্মা হিমালয় রঙে-রসে-রূপে ভারতীয় আত্মার দর্পণস্বরূপ।

'ভ্রমণ ও কাহিনী' নামে প্রবোধকুমার সান্যালের একটি বইয়ের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই বইটিতে হিমালয়ের পারে তিব্বতের কথা অথবা পুরীর কথা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে ভয়ঙ্কর গোবি মরুমি পরিক্রমায় বর্ণনা, সেই

সঙ্গে আছে গ্রীণল্যাণ্ডের মেরুপথে দুঃসাহসিক অভিযানের বর্ণনা। এই গ্রন্থের অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন হ'ল পৃথিবী বিখ্যাত মুসলিম ভ্রমণকারী ইবন বাতুতা ও তাঁর পর্যটন সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা। চতুর্দশ শতকের এক খ্যাতনামা ভ্রাম্যমান সম্পর্কে বিংশ শতকের এক কৃতী ভ্রাম্যমানের এই প্রবন্ধটি, ভ্রমণপ্রেমিক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য।

দেবতাত্মা হিমালয় গ্রন্থে প্রবোধকুমার সান্যাল যে আত্মসমাহিত ব্যক্তির হিমালয়ের প্রতি প্রেমের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন, তাঁর নাম, ইদানীং কৃতী ভ্রমণকারী ও ভ্রমণকাহিনীর লেখক হিসাবে প্রায় সব পড়ুয়া বাঙালীর চেনা। তিনি হলেন উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দেবতাত্মা হিমালয়ে উমাপ্রসাদ এক আশ্চর্য তপস্বী। তাঁরই বর্ণনায় হিমালয়ের পরিবেশ : "চারিদিকে প্রকৃতির কি প্রশান্ত রূপ··· রাত্রিদিন আসনে থাকতাম। আপনা হতেই ধ্যান আসে। চক্ষের পলকে রাত্রির আঁধার, দিনের আলো যেন কোথায় মিলিয়ে যেত। সত্যিই সেখানে—"দিনানি যত্র গচ্ছন্তি ক্ষণপ্রায়াণি দেহিনাম্।" কিন্তু শুধু অতিপ্রাকৃতের ধ্যান নয়, প্রাকৃত সৌন্দর্যের ধ্যানেও তিনি মগ্ন। তার পরিচয় আছে 'হিমালয়ের পথে পথে' গ্রন্থে—Valley of Flowers-এর বর্ণনায়, সেখানকার বিচিত্র রঙীন ফুলের বিচিত্রতর নাম গানে, হেমকুণ্ড ও লোকপালের মন্দির প্রসঙ্গে প্রকৃতি বর্ণনায়।

উমাপ্রসাদ কাবেরী কাহিনী, পঞ্চকেদার, গঙ্গাবতরণ, কুয়ারী গিরিপথ, মণিমহেশ, ত্রিলোকনাথের পথে, প্রভৃতি ভ্রমণকাহিনী লিখে বাংলা ভ্রমণসাহিত্যে স্থায়ী কীর্তি অর্জন করেছেন। তার মধ্যে গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখ যাত্রার কাহিনী অবলম্বনে গঙ্গাবতরণ লেখক হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত ত্রিলোকনাথ ও মণিমহেশ-এর স্থানিক বর্ণনায় উপরোক্ত গ্রন্থ রচিত। ত্রিলোক-নাথের মন্দির ও বিগ্রহ সবই হিন্দুর—কিন্তু তিব্বতী লামাদের হাতে তা থাকায়, এর সব কিছুই হ[illegible] উঠেছে বৌদ্ধ প্রভাবিত। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের ব্যাপক সংমিশ্রণ ও রূপবি[illegible] যে হিমালয়ের পরিবেশ একাকার, 'ত্রিলোকনাথের পথে' নামে গ্রন্থটিতে তার সুন্দর বিবরণ আছে। তুলনায় মণিমহেশ গ্রন্থটির বিবরণ বড় মনোরম। বর্ণনাভঙ্গী অত্যন্ত শান্ত ও সহজ। সম্ভবত ভ্রমণকালেও উমা-প্রসাদ নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত। হিমাচল প্রদেশের এই দুর্গম পার্বত্যময় অঞ্চল একটিমাত্র সহযাত্রীকে নিয়ে তিনি হিমালয়ের তুষার রাজ্যে পৌঁছে যান। ভ্রাম্য-মান হিসেবে তিনি ভারতবর্ষে বহুদিন থেকেই শ্রুতিকীর্তি। নন্দনকাননের উত্তরে

এক পার্বত্য অঞ্চলের নাম রাখা হয়েছে 'উমাপ্রসাদনগর'—তাঁর কীর্তিকে মহীয়ান করার জন্য। ভ্রমণ সাহিত্যেও উমাপ্রসাদের কীর্তি হয়ে উঠেছে অক্ষয়।

হিমালয় ও অন্যান্য পর্যটনযোগ্য স্থানের বর্ণনায় শঙ্কু মহারাজও বেশ কিছুদিন খ্যাতিলাভ করেছেন। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা, পঞ্চপ্রয়াগ গহনগিরি কন্দরে, উত্তরাস্যাং দিশি, নীলদুর্গম, চরণরেখা প্রভৃতি পাঠক-সমাজে বেশ চাঞ্চল্য এনেছে। 'উত্তরাস্যাং দিশি'—হিমালয়ের কাহিনীমূলক ভ্রমণকাহিনী, যাতে ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে মিশে আছে রোমাঞ্চ। এক কথায় 'মহাপ্রস্থানের পথে'র ছড়ানো পাথরের পুনঃপরিক্রমা। অবশ্য শঙ্কু মহারাজ যথার্থই হিমালয় প্রেমিক, এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। নীলদুর্গম ঠিক ভ্রমণ-কাহিনী নয়—এটি একটি সফল পর্বত আরোহণের আগাগোড়া বিবরণ। অবশ্য, বর্ণনায় ভ্রমণকাহিনীর আমেজ আছে। ২১২৬৪ ফিট উঁচু নীলগিরি পাহাড়ের শিখর বিজয় করার দুঃখজয়ী এই কাহিনীতে কারুণ্য-বিষাদ-গর্ব সবই মিশে আছে। চরণরেখা গ্রন্থটি দূরে-কাছে কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থানের বিবরণের সমষ্টি। তার মধ্যে কামারপুকুর-তোপচাঁচি-নেতারহাট-শিমূলতলা যেমন আছে, তেমনি আছে বৃন্দাবন-অমৃতসর-মথুরা প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণবৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষের রম্য তথা দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনায় সুবোধকুমার চক্রবর্তী পাঠকমহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য জাগিয়েছেন। তাঁর রম্যাণি বীক্ষ্য পর্যায়ের রচনাগুলিতে; দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর ভারতের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানের পৌরাণিক-ভৌগোলিক-ঐতিহাসিক কাহিনী একের পর এক বর্ণনা করে গেছেন লেখক। দক্ষিণ ভারত পর্ব দিয়ে শুরু হয়েছে ভ্রমণ পর্যায়; তারপর পর্ব থেকে পর্বান্তরে চলে গেছেন লেখক,—দ্রাবিড়-কর্ণাট-তামিল-রাজস্থান-হিমাচল-উত্তর-ভারত-কালিন্দী-ভাগীরথী পর্বের জোয়ারী বর্ণনায়। এই ভ্রমণপর্বগুলির মূল আকর্ষণ হ'ল তাদের মধ্যে জড়িয়ে থাকা ধারাবাহিক রোমান্সের জয়যাত্রা। কাহিনী গুলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে গোপাল নামে এক সর্বজ্ঞ তরুণ; শহর কলকাতার কেরাণীর পদে বৃত এই গোপালের সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সাক্ষাৎ ঘটে। রায়সাহেব অঘোর গোস্বামী, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের একমাত্র কন্যা স্বাতী বেরিয়েছেন দেশভ্রমণে। দুঃসম্পর্কের ভাগ্নে গোপালকে দেখে, রায়সাহেবের নাটকীয় হুকুমে ও পরিস্থিতির প্রয়োজনে গোপাল হয়ে উঠল তাঁদের ভ্রমণসঙ্গী, কিন্তু অন্য কামরায়, তৃতীয় শ্রেণীতে। সেই সাক্ষাতের জের চলে একাধিক ভ্রমণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রোমাঞ্চের নিপুণ প্লট হিসেবে। প্রথম পরিচয়ের সূত্র থেকে অজস্র ভ্রমণের পর গোপালের গোপন প্লেটোনিক প্রেমের কোন ছেদ যেমন নেই, তেমনি

স্বাতীর বয়সের কোন উত্থান-পতন নেই; সে তার অনন্ত-তারুণ্য নিয়ে প্রেম-বিরহ-মিলন-অভিমানের পরিবেশ রচনা করে সমস্ত পর্বগুলিতেই। গাইড বুক হিসেবে, মধুর-করুণ-কৌতুকরসে সিক্ত কাহিনী হিসেবে এবং ইতিহাস-ভূগোলের তাৎক্ষণিক জ্ঞান বৃদ্ধির উৎস রূপে এই ভ্রমণ সিরিজ পাঠকদের মন অবশ্যই আকর্ষণ করেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

[৪]

বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতন্ত্র স্বাদের কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছেন। প্রকৃতির প্রতি একাত্ম বিভূতিভূষণ বন-জঙ্গল-লতা-পাহাড়-এর মোহিনী টানে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেছেন বাংলা-বিহার-ওড়িশা-মধ্যপ্রদেশের ঘন অরণ্যময় পরিবেশে। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পরিচয় তিনি রেখে গেছেন আভিযাত্রিক, তৃণাঙ্কুর, উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও প্রভৃতি গ্রন্থে। এদের মধ্যে 'আভিযাত্রিক' নামে বইটিতে বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। তাঁর প্রকৃতি-প্রেম যেমন নিবিড়, তেমনি দূর গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষদের প্রতি মমতা, তাদের জীবনচর্যা সম্পর্কে হার্দ্য পরিচয়, তাঁর ভ্রমণকাহিনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আত্মবিস্মৃত এক পরিব্রাজকের পরিচয় এই বইটিতে ছড়ানো—যিনি গেছেন সেদিনের পূর্ববঙ্গের নদীপথে, বরিশাল শহরে, সেখান থেকে দূর গ্রামে, আরো দূরে চট্টগ্রামে; কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে গ্রাম্য সকল শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে তিনি প্রার্থিত আপনজন। চট্টগ্রাম থেকে সাম্পানে সমুদ্র উপকূলে যাত্রার বর্ণনা যেমন রোমাঞ্চকর, তেমনি হিমালয়ের পূর্বপ্রান্তে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নীচে ঝর্ণার ধারে প্রকৃতির রম্যতার অভিজ্ঞতাও মনোরম: "মনে হ'ত সমগ্র পৃথিবীতে আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মানুষ নেই, সমস্ত পৃথিবী আমার, গোটা তারাভরা আকাশ আমার…।" ভাগলপুর থেকে হাঁটাপথে দেওঘরে যাওয়ার রোমহর্ষক বর্ণনা এ গ্রন্থের সম্পদ। এমনই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে মধ্যপ্রদেশের কার্গিরোড স্টেশন থেকে দারকেশা নামে এক জায়গায় যাত্রায়। বিভূতিভূষণের ভ্রমণ-বর্ণনার ভাষা অনুপম ও মাদকতাময়। তাঁর ডায়েরী শ্রেণীর রচনার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন শুধু বহির্বঙ্গের প্রকৃতি নয়, আমাদের গ্রাম বাংলার তুচ্ছ লতাপাতা, তৃণক্ষেত্র, অরণ্যশীর্ষ, মানুষজনের বর্ণনার মাধ্যমে বিভূতিভূষণ কত সহজে অতিপ্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে গেছেন। উৎকর্ণ, হে অরণ্য কথা কও, ঊর্মিমুখর প্রভৃতি

গ্রন্থে ভ্রমণ-বর্ণনায় কি আশ্চর্য মায়াজাল ছড়ানো। দ্রুত ধাবমান ট্রেনে হোক, শিলাতলে অথবা বৃক্ষছায়ায় হোক, অথবা পায়ে হাঁটা পথেই হোক—চিরযাযাবরের অনমুকরণীয় ভাষায় একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, "মনেহয় যুগে যুগে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোন এক বড় দেবশিল্পীর হাতে আবর্তিত হচ্ছে, হয়তো দু'হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ইজিপ্টে, যেখানে নলখাগড়ার বনে, শ্যামল নীল-দের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধু-বান্ধবদের দলে এক অপূর্ব্ব শৈশব কেটেচে·· পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে ? কে জানে যে আবার পৃথিবীতেই জন্মাবো, ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় উঠেচে--ওর চারিপাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘুরচে, তার জগতে যেতে পারি...কে বলবে এ সব শুধুই কল্পনা বিলাস ? এ যে হয় না, তা কে জানে ?"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশ ও বিদেশের বহু স্থানেই একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন ; তার ফসল হিসেবে অভিনব বর্ণনা তিনি মেলে ধরেছেন "পথ চলতি" (দুইখণ্ডে) নামে গ্রন্থে। ঘরোয়া গল্প কথনে মধুর আমেজ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ; সেই বিশিষ্টতা তাঁর লেখায় ধরা পড়ে। 'লণ্ডনে দুর্গোৎসব' বর্ণনায়, কিংবা 'বিমানযোগে প্যারিস' যাত্রায় অথবা 'আরব মহানগরী'তে মুসলিম শিল্পসংস্কৃতির আলোচনায় এই মনোরম আমেজ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর রচনায় বিশ্বসংসারের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার যেমন পরিচয় আছে, তেমনি রয়েছে দার্শনিক ও স্থিতধী চিত্তের প্রশান্তি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর সঙ্গে পরিচিত এক সাধাসিধে দিনমজুরের কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "এই লোকটি যে কাজ করে তার জন্য কেউ তাকে অশিক্ষিত শ্রমিক বলে অনুকম্পার চোখে দেখে না, সে নিজেও কোন মতে নিজেকে ছোট ভাবে না"। মেক্সিকোতে বিমান বন্দরে, কথাচ্ছলে উৎসুক সুনীতিকুমাকে একটি তরুণ নিগ্রো বলে, "হ্যাঁ, স্যর, আপনি অধ্যাপক মানুষ আপনি বুঝবেন, আমি কলেজের ছাত্র, ডাক্তারি পড়ি, আর অবসর-কালে আমার বন্ধু, আর আমি এই কুলিগিরি করি।" এটি আমেরিকায় খুবই সাধারণ। 'ভ্রমণ প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে যাওয়ার সুন্দর বিবরণ আছে,—আছে সে দেশের সংস্কৃতি ও ভাষার, সংস্কৃত তথা ভারতীয় প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা। আবার ভারতীয়দের দীর্ঘ নামের প্রসঙ্গে এইচ জি ওয়েল্স-এর একটি মজার রচনার উল্লেখ আছে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ-প্রাপ্তি উপলক্ষে ইংলণ্ড ও ইউরোপে

যে একান্ত বিরূপ ও বিভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে রচনাটি ভারতবর্ষ সম্পর্কে ইউরোপীয় মানসকে প্রতিবিম্বিত করে। অজস্র ভাষা জানার সুযোগে লেখকের পক্ষে বিচিত্র ও জটিল পরিস্থিতিতে মুস্কিল আসানের কৌতুকপ্রদ বর্ণনাও এই গ্রন্থের বাড়তি আকর্ষণ।

ভ্রমণ-সাহিত্যে মুজতাবা আলীর অবদানও উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পৃথিবী, যে দেশ সম্পর্কে চঞ্চল সেই আফগানিস্থানের ঘনিষ্ঠ, ব্যাপক ও ঘরোয়া আলোচনার পরিচয় আছে তাঁর 'দেশে বিদেশে' নামে বহুপঠিত গ্রন্থে। আফগানিস্থান ও পাঠান চরিত্র সম্পর্কে বিচিত্র তথ্য দিয়েছেন আলীসাহেব। বৈঠকী রচনায় যে তাঁর জুড়ি নেই, এই সর্বজনমান্য তত্ত্বের পরিচয় এ বইতেও আছে ; এবং নিজের মতামত প্রতিষ্ঠায় তিনি অকাতরে উদ্ধৃতি দিয়েছেন গীতা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, এবং সক্রেটিশ থেকে ভল্‌টেয়ার পর্যন্ত। অরক্ষণীয়া মেয়ে বাড়িতে থাকলে যেমন বিষম বিপদ, তেমনি—"দেশভ্রমণে দেখলুম একই অবস্থা। মোকামে পৌঁছেই প্রশ্ন, দেশটার ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেব, কি দেব না।" দিলেই গালাগাল খেতে হবে, কারণ, "অরক্ষণীয়া কন্যার যেমন বিয়ে হয়নি, আফগানিস্থানের ইতিহাসও তেমনি লেখা হয়নি। আফগানিস্থান গরীব দেশ, ইতিহাস গড়বার জন্য মাটি ভাঙবার ফুরসুৎ আফগানের নেই, মাটি যদি সে নিতান্তই খোঁড়ে তবে সে কাবুলী মোন্‌-জোদড়ো বের করার জন্য নয়—কয়লার খনি পাবার আশায়।" সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় যেমন এ গ্রন্থে রয়েছে, তেমনি রয়েছে ইংরেজ-জার্মান-ফরাসী-রুশ রাজদূতাবাসের মানুষ-জনের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। আফগানিস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাস এই বইটির আকর্ষণ—যা সম্প্রতিকালে উদ্ভূত অনেক জটিল সমস্যার ওপর আলোকপাত করবে। আলীসাহেবের লেখা "জলে ডাঙায়" গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লেখার এমন গুণ, যেন মনে হয় পাঠকও ওই জলে অথবা ডাঙায় লেখকের সহযাত্রী। তিনি যেন উৎকর্ণ হ'য়ে শুনতে পাচ্ছেন মাঝিমাল্লার কথা, তাদের জীবনের ফুরিয়ে আসা পিছুটান, সমুদ্রের প্রতি আকর্ষণ। ভ্রমণের মধ্যে, এবং ভ্রমণ-সাহিত্যেও যে নিছক আড্ডার দুরন্ত পরিবেশ রচনা করা যায়, মুজতাবা আলীর লেখা না পড়লে, বিশ্বাস করা কঠিন।

মরুতীর্থ-হিংলাজ গ্রন্থটি একদা বাংলা সাহিত্যে সোরগোল সৃষ্টি করেছিল ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিমপ্রান্তের মরুঅঞ্চলের রোমাঞ্চকর তীর্থযাত্রারূপে। পাহাড় ভ্রমণ ও মরু ভ্রমণ যে এক নয়, এ গ্রন্থে তার মর্মান্তিক পরিচয় দিয়েছেন

অবধূত। হিংলাজ মাতা কি জয় ধ্বনিতে তীর্থযাত্রীরা মরুপথে অগ্রসর হ'লেও, এ যাত্রায় হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভ্রাম্যমান। ঘটনা বিস্তারে, চরিত্রচিত্রণে, মৃত্যুপ্রতিম অভিজ্ঞতায় ভ্রমণকাহিনীটির দুরন্ত গতি পাঠককে আকর্ষণ করে।

ঘরের কাছে ভ্রমণের একটি মনোরম আলেখ্য পাঠকদের উপহার দিয়েছেন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'দুয়ার হ'তে অদূরে' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের সেই বহুশ্রুত কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়—বহু ব্যয় করে আমরা দেখতে যাই নানা দেশ ঘুরে পর্বত – সিন্ধু, - কিন্তু, 'দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া। ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া। একটি ধানের শীষের উপরে। একটি শিশির বিন্দু।" মাঝেরহাট থেকে ফলতা, এই পঁচিশ মাইল পথ ঘণ্টাদুয়েকের যাত্রায় মন্থরগতি ট্রেনে ভ্রমণঅভিজ্ঞতায় সত্যিই তিনি আমাদের কাছে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ এনেছেন। স্টেশনে এসে দাঁড়ায় ট্রেন, আর মুগ্ধ বিভূতিভূষণের মনের পটে গাঁথা হয়ে যায় গ্রাম্যজীবনের টুকরো ছবি, মাঠ-গাছ-লতাপাতায় জড়ানো প্রকৃতি আর মানুষ…"স্টেশন থেকে বেরিয়েই রাস্তা। তার দুদিকে নারকেল আর সুপারির সারি…ষ্টেশনে আসবার জন্য এমন একটি বীথিপথ রচনা করেছে, কে সে সৌখীন মানুষ ?" ট্রেনযাত্রীদের তাৎক্ষণিক সংলাপ থেকে উঠে আসা এক একটি চরিত্র যেন নাটকীয় দৃশ্যাবলীর কুশীলব। একের পর এক এই সব দৃশ্য সম্পাদনা করে গেছেন লেখক – বর্ণনার সাজে, ভাষার প্রতীকে, ইঙ্গিতে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে যাওয়া বিকল ট্রেন থেকে নেমে, চলে যান গ্রামের ভিতরে : তারপর চিত্রিত ভাষায় মেলে ধরেন গ্রামের মানুষজন, দোকানদার, স্কুলের ছোট্ট মেয়ের দল, বাস ড্রাইভার প্রভৃতি মিছিলপ্রতিম মানুষদের কথা। তাঁরই নিজস্ব স্মৃতিচারণের ভাষায়—'কেমন যেন সব জড়িয়ে যাচ্ছে, না…কি করব, এই জটপাকানো আবর্তই আমার আনন্দ, এই নেশাতেই কাশ্মীর হ'লনা, রামেশ্বরম্ হ'ল না, আরো কত কী যে হ'ল না, তার হিসেব—কি হিসেব রেখেছি ?" পাঠক হিসেবে আমরা বলি— "না হোক ; হ'লে কি দেখতে পেতাম এমন আশ্চর্য শিশিরবিন্দুর সমাহার,—যার মধ্যে বাঙালীর করুণ-মধুর নাটক প্রতিবিম্বিত ?"

প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যাত্রার বিবরণ দিয়েছেন কালকূট, তাঁর 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' নামে গ্রন্থে। পুণ্যার্থী যাত্রীদের মধ্যে অতৃপ্ত কামনা-বাসনার বিচিত্র জোয়ারের উত্থান-পতনের কাহিনীতে ভরা এই কাহিনী। সব মিলিয়ে দেহাতীত প্রবৃত্তির মধ্যে আর্ত মানুষের রঙীন মিছিল।

বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় নানা বিবরণ লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন,

তাঁদের মধ্যে দিলীপকুমার রায় ('দেশে দেশে চলি উড়ে'), মনোজ বসু ('চীনদেখে এলাম'), সতীনাথ ভাদুড়ী (সত্যি ভ্রমণ কাহিনী) উল্লেখের দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনীর স্রোতে ইদানীং প্লাবন এসেছে। এক কালে যা ছিল শীর্ণ জলধারা, আজ তা উর্মিমুখরতায় ভরা নদী। বেশ কিছু দিন ধরেই নানা ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে। তার সবগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্ভব নয়; অনেক অনেক দামী রচনা হয়ত দৃষ্টি এড়িয়েছে। একই স্থানের একাধিক ভ্রমণবৃত্তান্ত রয়েছে অজস্র; কয়েকটি স্বাদে ভিন্ন হওয়ায় উল্লেখের যোগ্য—যেমন রাণী চন্দ লিখিত 'পূর্ণকুম্ভ' এবং 'হিমাদ্রি', বীরেন্দ্রনাথ সরকারের 'রহস্যময় রূপকুণ্ড', মৈত্রেয়ী দেবীর 'অচেনা চীন', রামানন্দ ভারতীর 'হিমারণ্য' ইত্যাদি।

বাঙালী নিছক আনন্দের তাগিদে ভ্রমণ করতে ভালোবাসে; সাহিত্যের প্রতি তার প্রীতিও বহুবিদিত। এই দুটি প্রিয় জিনিসের সমন্বয় ঘটেছে ভ্রমণ-সাহিত্যে। সব ভ্রমণবর্ণনাই অবশ্য সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠেনি, আবার, সব বৃত্তান্তে পথভোলা পথিকের চিরকালীন জিজ্ঞাসাও নেই। না থাক, আমরা যারা "যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না"-র ঘূর্ণীতে ঘুরে মরি, তাদের কাছে ভ্রমণকাহিনীর স্বাদ তাপদগ্ধ গ্রীষ্মে কালবোশেখীর মনোরম আমেজ : বৃষ্টি না আসুক, হাওয়ায় তো পরিবর্তনের আভাস কান পেতে শোনা যায়!

প্রসঙ্গ : বই

ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে, মানুষের জ্ঞান ছিল পুঁথিনির্ভর, অভিজ্ঞতা ছিল শ্রুতিনির্ভর। ছাপার হরফের ব্যাপক ব্যবহার দেশে-বিদেশে মানুষকে পুঁথি ও শ্রুতির দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। একথা যেমন সত্য, তেমনি ইতিহাসের বিবর্তনে একথাও সমান সত্য, সভ্য মানুষ ছাপার হরফের ওপর আজ অতিনির্ভরশীল। শ্রুতির যুগে, তবু তো কণ্ঠ এবং শ্রবণের ব্যবহার ছিল ; ছাপার হরফের যুগ থেকে দৃষ্টির ব্যবহারে এসেছে অকারণ একাধিপত্য। অবস্থাটি যে বেশ জটিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ অবস্থায় এসে পৌঁছতে মানুষের কয়েকশো বছর লেগেছে, সামাজিক-অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের বিপর্যয়ে।

১৪৫০ সালে গুটেনবার্গের ছাপার আধুনিক পদ্ধতি আবিষ্কারের পর জগৎসংসারের কার্যকারণ সম্পর্কে জ্ঞানের যে আধিপত্য ছিল পুরোহিত-যাজক সমাজের একান্ত নিজস্ব, তার অনড় অচলায়তনে একদিন ফাটল ধরল। সামাজিক কাঠামোর নিয়ামক হিসেবে মন্দির-মসজিদ-চার্চ-সিনাগগ্-ভিত্তিক বুরোক্র্যাসীকে একদা মনে করা হ'ত অমোঘ ও অভ্রান্ত ; ছাপাখানা এবং কাগজের যৌথ মিলন মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসার জোয়ার আনল—তার স্রোতে এই ব্যুরোক্র্যাসীর সর্বত্র সঞ্চারী প্রভাব বিক্ষিপ্ত হ'ল দূরে দূরান্তে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে। অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, এই শ্রেণীর ব্যুরোক্র্যাটরা ছাপাখানার সুযোগ নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে বা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু মানুষের সীমাহীন জিজ্ঞাসা এবং বিপুল পরিমাণে বইয়ের প্রসার, তার জ্ঞানের দিগন্তকে করেছে আলোকিত। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, মানবসমাজে বইয়ের ভূমিকা যতখানি প্রচারিত তার মধ্যে কিছুটা অত্যুক্তি রয়েছে। কেন না বইয়ের সংখ্যা যে পরিমাণে বেড়েছে, প্রথম যুগে—সে পরিমাণে সাক্ষরতা বাড়েনি। তাই অনুন্নত দেশে, বিশেষ করে এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বইয়ের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা বিংশ শতাব্দীর আগে বিশেষ করে বোঝা যায়নি, অন্তত ব্যাপকভাবে তো নয়ই। আজো ভারতবর্ষে, ৩১ বছর স্বাধীনতার পরেও মাত্র শতকরা তিরিশ জনের অক্ষর পরিচয় আছে। তার মধ্যে বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কতজনের? উন্নত দেশগুলির কথা মনে রেখে, অনেক সমাজতাত্ত্বিকই মানবজীবনে বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ,

আমাদের দেশের মানুষদের সম্বন্ধে তার অনেক কিছুই প্রযোজ্য নয়। এ অবস্থায় বই-পড়ুয়াদের সামাজিক ভূমিকা কতদূর প্রসারিত হতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট জিজ্ঞাসার অবকাশ রয়ে যায়।

এই জিজ্ঞাসার অন্যতম কারণ হ'ল গ্রন্থপ্রেমিকেরা বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে যতই সরব হোন না কেন, বই প্রকাশের প্রথম যুগে, লেখক ও পাঠক খুব যে মান-সম্মানের অধিকারী ছিলেন তা নয়। সামাজিক ভূমিকায় বই তার বিপ্লবাত্মক রূপ ধারণ করেছে, অনেক পরে। বই যখন ব্যাপকভাবে জনসমাজে ছড়িয়ে পড়তে লাগল তখন যাজক-পুরোহিত সমাজের মানুষেরা যেমন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের প্রসারকে ভালো চোখে দেখেননি, অভিজাত সমাজও তেমনি গোটা বিষয়টিকে তাচ্ছিল্যকর বলে ভাবতেন। সমাজের মাথা হিসেবে তাঁরা শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণা করতেন, একথা ঠিকই, কিন্তু সেই কারণেই লেখকদের করুণা ও অবজ্ঞার পাত্র রূপে মনে করতেন। যাঁরা অভিজাত বংশের সন্তান, তাঁরা বইয়ের লেখকরূপে পরিচিত হওয়াকে মর্যাদাহানিকর বলে ভাবতেন। আজকের সমাজে অর্থাৎ বিংশ শতকের শেষ পর্যায়ে এসব কথা গল্পের মত বলে মনে হলেও, ঐতিহাসিক সত্য। শুধু তাই নয়, ছাপানো বইয়ের চেয়ে, হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির মাহাত্ম্য ছিল সেদিনের লেখকদের কাছে অনেক বেশী। স্বয়ং শেক্‌সপীয়ার পর্যন্ত এই রক্ষণশীল মনোভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রীভ্ (১৬৭০-১৭২৯)-এর মত খ্যাতনামা নাট্যকার পর্যন্ত মনে করতেন, লেখক হিসেবে তাঁর মর্যাদা, ভদ্রলোকের মর্যাদার চেয়ে অনেক কম। তাঁকে লেখক হিসেবে কেউ সম্বোধন করলে, কিংবা পরিচয় দিলে, তিনি অপমানিত বোধ করতেন। সেদিনের অভিজাত সমাজের মানুষেরা লেখকদের সঙ্গে কোন পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতার কথা গোপন করতেন।

বইয়ের লেখকদের নিজের সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যে যুগে এত সঙ্কোচ তথা অনীহা ছিল, সে যুগে সমাজেবইয়ের ভূমিকা কতদূর সম্মানজনক ছিল, তা অবশ্যই জিজ্ঞাসার বিষয়। বইয়ের লেখক হিসেবে পরিচিতি হওয়া যেমন সমাজের প্রভাবশালী অংশের কাছে সম্মানজনক ছিল না, তেমনি লেখক যদি পেশাদার হতেন, তা হলে তা আরো লজ্জাজনক বিষয় বলে মনে করা হত। টমাস গ্রে (১৭১৬-১৭৭১) তাঁর "Eelgy" কবিতার জন্য খ্যাতি পেয়েছেন, অবজ্ঞাত ও নীচু শ্রেণীর মানুষদের জীবনকাহিনী বর্ণনা করার জন্য, অথচ মজার কথা এই যে, এই কবিতার জন্য তিনি টাকা নিতে চাননি, পাছে ভদ্রলোক হিসেবে সমাজে

তাঁর মর্যাদা কমে যায়। ওয়াল্টার স্কট অজস্র গ্রন্থ লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন ইংরেজী সাহিত্যে, কিন্তু তিনি ভূস্বামী হিসেবে একজন মাননীয় ভদ্রলোক বলেই পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন – লেখকরূপে নয়। সাম্য ও স্বাধীনতার পূজারী বায়রণ পর্যন্ত উনিশ শতকের গোড়ায় বলেছিলেন, "কে লিখতে চাইবে যদি তার অন্য কোন ভাল কিছু করার থাকে?" রোম সাম্রাজ্যের পতনের ঐতিহাসিক গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পর গ্লস্টারশায়ারের তৎকালীন ডিউক, এডওয়ার্ড গিবনকে বলেছিলেন, "এঃ, মিস্টার গিবন, আবার একটি মোটা বই লিখেছেন—খালি লিখছেন, লিখছেন, আর লিখছেন, লিখছেন, আর লিখেই যাচ্ছেন, মিস্টার গিবন!" আমাদের দেশে, ট্রেনে ভ্রমণরত সহযাত্রীকে, রবীন্দ্রনাথের লেখক হিসেবে আত্ম-পরিচয়ের সেই বহুশ্রুত কাহিনী অনেকেরই এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে।

বইয়ের যে তাৎপর্যজনক সামাজিক ভূমিকা ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দেশে তার মৌল কারণ, শুধু যে ছাপাখানার ব্যাপক প্রসার তা নয়; আঠারো শতকের শেষে, ফরাসী বিপ্লব, অভিজাত সমাজের উন্নাসিক মনোভাবকে বিধ্বস্ত করে তার সমগ্র অস্তিত্বে আতঙ্কের সূচনা করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এল পুরনো ধ্যান-ধারণা বর্জনের জোয়ার—অবশ্যই পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে এবং ইংলণ্ডেও। নতুন যুগের মানুষদের আবির্ভাব ঘটে, শুরু হয় বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ আঠারো শতকে, এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সর্বতোমুখী প্রয়াসে তা ছড়িয়ে পড়ে জাগ্রত, নতুন মানুষদের মধ্যে। তাদের জিজ্ঞাসা হয়ে উঠল অফুরান, ছড়িয়ে পড়ল স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে জিজ্ঞাসু তরুণের ভীড়। আসল কথা হল, বই মানুষকে এনে দিল ব্যক্তিগত সমস্যার আলোয়, নতুন জিজ্ঞাসার অভিনব উত্তর। বিদ্যাচর্চা কি আগে ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সে বিদ্যা ছিল আরোপিত ব্যক্তিমানুষের, তথা সাধারণ জনসমাজের ব্যক্তিগত জীবনচর্যার নিরিখে তার যাচাই হয়নি। অভিজাত বা ভদ্রশ্রেণীর মানুষদের বাইরে যে বৃহৎ জনসমষ্টি পড়েছিল, বই তাদের সামনে হাজির হল নতুন যুগের নতুন কষ্টিপাথরের ভূমিকায়।

বই বা পত্র-পত্রিকার সামাজিক ভূমিকা এমনি করে, একটু একটু বাড়তে শুরু করল। নতুন যে বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তারা জীবনে বইয়ের মূল্যবোধ সম্পর্কে পূর্বতন অভিজাতদের মত সংশয়ী ছিল না। সাক্ষরতার ব্যাপক প্রসার ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বই সম্পর্কে মানুষেরা সোচ্চার হলেন: কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর জন্য নয়, সমাজের সমস্ত শ্রেণীর জন্যই। তার রূপায়ণ সম্পর্কে অবশ্যই মতবিরোধ থাকতে পারে, কিন্তু উনিশ শতকেই, বিশেষ করে ভিক্টোরীয়

যুগে বই পড়ে জ্ঞানঅর্জন করা, বই কিনে সম্পদরূপে ঘরে রাখা—মানী-গুণীদের অন্যতম সামাজিক শর্ত হয়ে দাঁড়াল।

এই অবস্থায় কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১)-এর মন্তব্য আশ্চর্যের নয়: "Ten ordinary histories of kings and courtiers were well exchanged against the tenth part of one good history of Book-sellers". রাজভক্ত ইংরেজদের এই মন্তব্যে—তাও আবার ব্যবসাদারের সঙ্গে রাজার ইতিহাসের তুলনার মধ্যেই বোঝা যায়, বই সম্পর্কে মানুষের চিন্তাধারায় ওলোট-পালোট ঘটে গেছে।

আমেরিকার স্মরণীয় চিন্তাবিদ হেনরী ডেভিড থোরো (.৮১৭-১৮৬২) বলেছেন "বই হ'ল পৃথিবীর সঞ্চিত সম্পদ, প্রজন্ম ও জাতিসমূহের যথার্থ উত্তরাধিকার"। এখন, কথা হল এর আগের যুগের মানুষেরা কি বই সম্পর্কে সপ্রশংস ছিলেন না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছিলেন। বই সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মিলটন—"একটি ভালো বই মননশীল আত্মার জীবনীশক্তি—", স্মরণীয় উক্তি আছে ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬)-এর—"চতুর মানুষেরা এই পড়াকে অবজ্ঞা করে, সরল মানুষেরা প্রশংসা করে, এবং জ্ঞানীরা তাকে ব্যবহার করে।" কিন্তু সে প্রশংসার এমন ব্যাপক সামাজিক স্বীকৃতি ছিল না। সেই স্বীকৃতি এসেছে ধীর গতিতে, কিন্তু নিশ্চিত জয়ের লক্ষ্যে। উনিশ শতকের গোড়ায় রবার্ট সাদে (১৭৭৪–১৮৪৩) কবিতার মাধ্যমে বলেছিলেন যে, বইয়ের মাধ্যমে তিনি পেয়েছেন আনন্দের উৎস, দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা। মৃত লেখকদের রচনার স্রোতেই ভেসেছে তাঁর দিন। রবীন্দ্রনাথ তো বইয়ের সংগ্রহশালা তথা লাইব্রেরী সম্পর্কে লিখেই ফেললেন উনিশ শতকের শেষের দিকে,—'মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, মানব আত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে···কে জানিত সংগীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! ...অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের উপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে।"

প্রখ্যাত লেখক সমারসেট' ম'ম বলেছেন যে "তিনি কবিতা পড়েন সমালোচক হিসেবে নয়, তিনি কবিতা পড়েন সান্ত্বনার জন্য, মনকে তাজা করে তোলার জন্য

এবং শান্তি পাবার আশায়।" সংবেদনশীল মানুষের কাছে, বই, যথার্থ ই একটি মহৎ সম্পদ। বই পড়া সম্পদ বলে গণ্য হলেও, সে সম্পদ সকলের ক্ষেত্রেই যে আহরণযোগ্য, এমন তত্ত্বে সকলেই আস্থাবান নন। এমার্সন বলেছেন, "Good Reading is an art"—অথচ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ না করলেও, ভালো জাতের পড়ুয়াকে লেখক বা সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষ শিল্পী হিসেবে কি মর্যাদা দেবেন? বোধ হয়,—না। ডি এইচ্ লরেন্স্ এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন, "ভ্রান্ত গণতন্ত্রের একটি ধারণাকে আমি ভুল বলে মনে করি; তা হ'ল ছাপার হরফ যে পড়তে পারে, সেই যে-কোন ছাপানো বই পড়তে সক্ষম। অত্যন্ত গুরুগম্ভীর বই সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে রাখা হয়, যেমন আগেকার দিনে ক্রীতদাসদের নগ্ন করে, বিক্রি করার জন্য দেখানো হত—আমি এ অবস্থাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করি।"

বইয়ের সৎ ব্যবহার কেমনভাবে করা উচিত, এ প্রসঙ্গে তাই অনেক তত্ত্ব, অনেক উপদেশ প্রচারিত হয়েছে। তাই বই পড়ার প্রকরণগত উপদেশ থাকলেও, বই পড়া যে শিল্পকর্ম তা বলা হয় না। যা বলা হয়, তা লেখকদের নিজস্ব ধারণা,—বিশেষ বিশেষ বই সম্পর্কে পক্ষপাত মাত্র। আসলে বই পড়ার শিল্পগত দিক হ'ল জীবনের পূর্ণতার দিকে তীর্থযাত্রা বিশেষ—গ্রন্থপ্রেম হ'ল জীবনের সঙ্গে সাহিত্য বা দর্শন বা প্রজ্ঞার মিলন। কেন না, বইয়ের কার্যকরী ভূমিকা হ'ল যে, তা আমাদের জীবনকে একদিকে যেমন পরিশুদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি অনুপ্রাণিত করে নতুন ভাবনায়। এই ভাবনা-চিন্তা ব্যক্তিগত মানসিক গঠনের ওপর নির্ভরশীল। কারোর ওপর তা চাপিয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা অনেকেই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি এই ধারণায় যে পাঠক হিসেবে আমরা অনেক কুশলী—যা আমরা হয়ত নই; অন্তত যাঁরা কেমনভাবে ভালো পাঠক হওয়া যায়, তাঁরা তো নিশ্চয়ই। ইদানীং ভালো করে পড়ার পদ্ধতি, উপায়, উপযোগিতা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে, ভাবনা-চিন্তাও হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের, কিভাবে ভালোভাবে পড়া শেখানো যায়। কথা হ'ল শেখানো হবে কোনটি? লিখিত শব্দের কুশলী বাহার? না, তার সাহায্যে বিশ্বজগতের ভিতরের ও বাইরের রূপ?

আসলে শব্দের ব্যবহার ও তার অর্থগত ইঙ্গিত যেমন আমরা পড়ার ক্ষেত্রে শিখে থাকি, তেমনি শব্দ যার প্রতীক, সেই বিষয় বা বস্তু সম্পর্কেও কিছু শিখে থাকি। শব্দসজ্জাকে শুধু চোখের মাধ্যমে দেখা বা দেখার পর উচ্চারণ করা

নিতান্ত অর্থহীন। আমাদের ভালোমন্দ লাগার মনোভাবকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যাই পড়ার ক্ষেত্রে! সেই পাঠ, আমাদের ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের অভিজ্ঞতার নিয়ামক, অন্তত তাদের কিছু না কিছু আকার দান করে থাকে। অর্থাৎ, পড়া ব্যাপারটি নিছক আনন্দ নয়, নিছক পরিশ্রমও নয়। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের কোন নিরিখ বা সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নেই। তা একান্তই ব্যক্তিগত। তাই লরেন্স-এর কঠোর মন্তব্যে যুক্তি থাকলেও, শেষ পর্যন্ত বই পড়ার ক্ষেত্রে অধিকারী-অনধিকারীর প্রশ্ন নিতান্তই গৌণ। ভালো পাঠক সব সময়েই নিজেকে প্রস্তুত করে বহুদিনের অধ্যবসায়ে। এখানে কে যোগ্য, আর কে যে অযোগ্য, তা ঠিক করা কঠিন। বয়স্ক পাঠকদের ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ধারণা অনুযায়ী জানা যায়, বুদ্ধি বা সাফল্য, অর্থ বা খ্যাতি, বৃত্তিগত যোগ্যতা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী—কোন কিছুই, ভালোভাবে বই পড়তে পারার কোন নিরিখ বা সূচক নয়। সমাজের উচ্চমঞ্চের মানুষেরা পড়ার ক্ষেত্রে একেবারে নীচের সারিতে চলে যেতে পারেন।

বইয়ের মধ্যে, শব্দের সাজে যা ছড়িয়ে থাকে, তা লেখকের কাছে পূর্ণ পরিণতির প্রকাশ; কিন্তু পাঠকদের মনে সেই বীজ একদিন বনস্পতি হয়ে ওঠে। কিন্তু তা হয়ে ওঠা নির্ভর করে সেই "মানব জীবন" এর উৎকর্ষের ওপর। বই, শব্দের দ্বারা রূপান্তরিত জীবন, এবং এই শিল্পিত জীবন,—রক্ত-মাংস অস্থি মজ্জার ঘাত প্রতিঘাতে চেনা জীবনের মতই রহস্যময়। জীবনকে তার বৈচিত্র্যে বিস্মিত করলেও, বই তথা শব্দশিল্প কিন্তু জীবনের পরিবর্ত নয়; কারণ জীবনের কোন সমান-বিনিময় নেই। সোজা কথায়, জীবনকে প্রশস্ত ও চির-প্রসার্যমান করে তুলতে, শিল্প হিসেবে বই অনন্য।

বইয়ের প্রভাব শুধু যে পড়ার সময় উপলব্ধি করা যায়, তা নয়। কোন কোন বিরল মুহূর্তে প্রিয় লেখকের শাণিত কোন লাইন মনে পড়লে, জগৎ সংসারের রঙ্ হঠাৎ যেন বদলে যায়। কোন এক বিকেলের পড়ে আসা রোদে, আনমনা মুহূর্তে যখন মনে হয়, জীবন কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, তখন জীবনানন্দের কয়েকটি লাইন চকিতে মনে পড়ে, "জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—/ তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার! / হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে / সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার / শিরীষের অথবা জামের / ঝাউয়ের—আমের; কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে..."

কিংবা কোন নির্মম বিচ্ছেদের মধ্যে জীবনের অনির্দেশ্য নিষ্ফলতার কথা ভাবতে ভাবতে, রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকের শেষসংলাপটি বুকের মধ্যে বাজতে থাকে—"সুধা তোমায় ভোলেনি"—যার সেই মুহূর্তেই পাঠক হিসেবে আমাদের চেতনার উত্তরণ ঘটে, এবং জীবন তার হাজারও গ্লানি ও কুশ্রীতার মধ্যে মেলে দেয় তার ঐশ্বর্য। কল্পনা শক্তি না থাকলে এই কারণেই ভালো জাতের পাঠক হওয়া যায় না। বইয়ের মাধ্যমে যখন পাঠকের অনুভূতির পুনর্জন্ম ঘটে, তখনই সে সার্থক—প্রায় শিল্পীর সগোত্র। তার শিল্প মাধ্যম কাগজ কলম নয়, তার মাধ্যম হ'ল বই এবং তার হৃদয়ের সংযোগ। তারই ফলে পাঠক খুঁজে বেড়ায় অদেখা মানুষকে,—বাউল গানের ভাষায় যার পরিচয় হ'ল "আমার ঘরের কাছে আরশি নগর, সেথা এক পড়শি বসত করে, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে"। বলা বাহুল্য এ অন্বেষণ শিকারীর শিকার খুঁজে বেড়ানো নয়—যা করে থাকেন তথ্য-পিপাসুরা; তা হ'ল নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্যে, দুর্গম পথে যাত্রার মত। আর, এই আবিষ্কারের জয়োদ্ধত ঘোষণা শোনা যায় প্রথম যৌবনেই। গ্রন্থপ্রেমিক যৌবনসুলভ সেই ঘোষণা শুনতে চান উৎকর্ণ শ্রুতিতে। কিন্তু তার ফলে অনুভূতির রাজ্যে রামধনুর রঙীনতা সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু মগ্ন পাঠক তখন সজাগ ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার না করে, মনকেই বেশী ব্যবহার করে; তার বই পড়া জ্ঞান, তার বিচারবোধকে করে সংকীর্ণ। দৃষ্টি-শ্রুতি-ঘ্রাণ-স্পর্শ যে জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আদিম উৎস, সে কথা সে ভুলে যায়। নতুন জাতের, নতুন যুগের লেখক এসে, তাকে তার কৃত্রিম ঘেরা-টোপের বাইরে নিয়ে যায়, তাকে বুঝিয়ে দিয়ে যায়, আমাদের শরীরী ইন্দ্রিয়গুলির সচল ও সক্রিয় ব্যবহারই মস্তিষ্ককে যোগায় তার সতেজ শক্তি। অর্থাৎ সচেতন পাঠকের মধ্যে চলে গ্রন্থের জগতের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের নিপুণ বিশ্লেষণ। আসল কথা হ'ল বই আমাদের মনকে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে প্ররোচিত করে, চ্যালেঞ্জ করে অজানা পথের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়তে। বইয়ের বিস্তৃতি জীবনের মত, বৈচিত্র্যময়। বই পড়ার ক্ষেত্রেও হারানো সুযোগের জন্য, আমাদের অনুতাপ করতে হয়। যাঁরা সেরা পড়ুয়া তাঁরাও আক্ষেপ করে থাকেন যে, তাঁদের পড়ার মধ্যে রয়ে গেল অনেক ফাঁকি—এ যেন নিউটনের বহুশ্রুত আক্ষেপের সমধর্মী জ্ঞান সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ানোর মত। কত ভালো বই, সেরা বই পড়া হয়ে ওঠে না, অথচ সময় চলে যায়, জীবন আস্তে আস্তে মেলে দেয় তার নিঃস্ব নিষ্ফলতা। মনে হয়, কিছুই জানা হ'ল না, কিছুই হয়ত জানা যায় না—

ন মেধয়া, ন বিভয়া, ন বহুনা শ্রুতেন চ।

সম্ভবত সেই কারণেই বই পড়ে জানার চেষ্টাকে ব্যঙ্গ করার মনোভাব গড়ে উঠেছে দেশে-বিদেশে। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভালো নয়, বই পড়ার ক্ষেত্রেও নয় ; আর. সর্বম্ অত্যন্তম্ গর্হিতম্—একথা তো আমরা বই পড়েই শিখেছি। কোনটি যে 'অত্যন্তম্', আর কোনটি তা নয় তার ভেদরেখা টানবে কে ? মানুষের রুচি ও ভালোমন্দ লাগায় বৈচিত্র্য আছে বলেই কারো ব্যক্তিগত চরিত্রের স্বাভাবিক গুণপণাকে, অন্য কারোর বাড়াবাড়ি বলে মনে হ'তে পারে। হয়ত, তাই পড়ুয়াদের কপালে জুটেছে নানা ধরণের বদনাম, ব্যঙ্গোক্তি, উপহাস—তা কখনো Book worm তথা বইয়ের পোকা, কখনো Bibliomania বা বইপাগলা ইত্যাদি। পড়ুয়াদের স্বভাবে আবার কোন কোন মনস্তাত্ত্বিক অপবাদের বোঝাও চাপিয়েছেন : যারা অমিশুকে, লাজুক, আত্মকেন্দ্রিক – এক কথায় Introverted বা অন্তর্মুখী, তাদের অন্যতম লক্ষণ হ'ল বইয়ের প্রতি অনুরাগ।

কিন্তু বইয়ের প্রতি যাদের অনুরাগ, সুখে-দুঃখে, শোকে-আনন্দে গড়ে উঠেছে, তাদের এ অপযশ বা নিন্দার কোন মূল্য নেই। তাদের জন্যই দেশে-বিদেশে গড়ে উঠেছে লাইব্রেরী ছোট-বড় মাঝারি সব রকমেরই। কোন কোন অশান্ত ও বিক্ষিপ্ত মুহূর্তে যাদের কিছু সময়ের সঙ্গী প্লেটো অথবা সেনেকো, যাদের নিষ্পাপ ও নিরুত্তাপ জীবনের অবলম্বন টুর্গেনিভ কিংবা মোপাসাঁ, টলস্টয় কিংবা সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ অথবা হুইটম্যান,—তারা ভিতরে ভিতরে সঞ্চয় করেন অফুরান শক্তি, স্থৈর্য এবং প্রজ্ঞা। মহাকালের মিছিল, একের পর এক পটপরিবর্তন করে তাদের চোখের সামনে। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কত ভাঙা-গড়ার বিবর্তন ঘটে যায়, মানুষ আসে আবার চলে যায়—যুগান্তর ঘটে সমাজের, রাষ্ট্রের, জীবন-দর্শনের। মানুষের জীবনচর্যা বদলায়, জ্ঞানের দিগন্ত ছড়িয়ে যায় ইতিহাসের রক্তাক্ত মিছিলে। তার সালতামামি করার সুযোগ ঘটে পরবর্তীকালে, কালো অক্ষরে ভরিয়ে রাখা বইয়ের পাতায়। মানুষ পড়ে, জানে, শেখে, ভুল করে, সংশোধন করে – বিবর্তনের ধাপ পেরিয়ে যায় শতাব্দীর আলো-অন্ধকার পেরিয়ে নতুন জগতে।